গুজরাতের সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নিয়ে অরুন্ধতী রায়

ঘাতকের পদধ্বনি

অনুবাদ : শিবব্রত বর্মন

দি গড অফ স্মল থিংস-খ্যাত ঔপন্যাসিক অরুন্ধতী রায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ইস্যুতে সব সময়ই সোচ্চার। সম্প্রতি ভারতের গুজরাত রাজ্যে সরকারি মদদে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে তার এ মূল্যায়নটি বেরিয়েছে *আউটলুক* পত্রিকার ৬ মে সংখ্যায়। লেখাটি কিছুটা সংক্ষেপিত আকারে এখানে ছাপা হলো।

গত রাতে আমার এক বন্ধু বরদা থেকে ফোন করেছিল। কান্নাকাটি করছিল সে। ব্যাপারটি যে কী, সেটা বলতে সে ১৫ মিনিট সময় লাগিয়ে ফেলল। ঘটনাটি খুব সরল। বেশি কিছু না, তার এক বান্ধবী সাঈদার ওপর একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক হামলা চালিয়েছে। তেমন কিছু না, তার পেট ফেঁড়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে দিয়েছে ওরা। তার মৃত্যু ঘটার পর কেউ তার কপালে 'ওঁ' কথাটা লিখে দিয়েছে।

কোন হিন্দুশাস্ত্রে এ উপদেশ দেওয়া হয়েছে?

আমাদের প্রধানমন্ত্রী এ জাতীয় হামলা জায়েজ করতে গিয়ে বলেছেন, গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেন জ্বালিয়ে দিয়ে মুসলমান 'সন্ত্রাসবাদীরা' ৫৮ জন হিন্দু যাত্রীকে হত্যা করার প্রতিশোধ হিসেবে বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা এসব কর্ম করেছে। এসব বীভৎস হত্যাকাণ্ডের যারা শিকার হয়েছে, তারা প্রত্যেকে কারো না কারো ভাই, কারো না কারো মা, কারো সন্তান। হ্যাঁ তা তো বটেই।

কোরানের কোন আয়াতে লেখা আছে মানুষকে এভাবে পুড়িয়ে মারতে হবে?

যতই দুপক্ষ একে অপরকে হত্যা করার মাধ্যমে তাদের ধর্মের পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে, ততই তাদের মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ছে। তারা একই বেদিমূলে অর্ঘ্য দেয়। একই জিঘাংসার দেবতার পূজারী তারা। পরিস্থিতি এমন চরম জঘন্য রূপ নিয়েছে, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এ চক্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অত্যন্ত পরনিন্দুক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করেন।

এ মুহূর্তে আমরা এক বিষের পেয়ালা পান করছি। চুষে নিচ্ছি ধর্মীয় ফ্যাসিবাদে মাখানো এক ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র। খাঁটি আর্সেনিক।

আমাদের কী করা উচিত? কী করা সম্ভব আমাদের পক্ষে?

আমাদের ক্ষমতাসীন দল নিজেই একটি রোগের মতো। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাদের কথার ফুলঝুরি, পোটো নামে এক আইন পাস, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খঞ্জর উত্তোলন (সেই সঙ্গে পারমাণবিক হুমকি), সীমান্তে প্রায় ১০ লাখ সতর্ক সৈন্য মোতায়েন এবং সবচেয়ে যা ভয়াবহ স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইয়ের সাম্প্রদায়িকীকরণ ও ইতিহাস বিকৃতি—এত কিছু করার পরও একের পর এক নির্বাচনে অপমানিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি এ দল। এমনকি তাদের দলের পুরনো কৌশল—অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মানের ইস্যু উসকে দেওয়া—সেটাও কাজ করেনি। এ রকম অবস্থায় বেপরোয়া হয়ে তারা গুজরাত রাজ্যে ত্রাতার ভূমিকা নিয়েছে।

ভারতের একমাত্র বিজেপি সরকার শাসিত রাজ্য গুজরাতে বহুদিন ধরে এক গভীর রাজনৈতিক এক্সপেরিমেন্টে তা দেওয়া হচ্ছিল। গত মাসে এ এক্সপেরিমেন্টের প্রাথমিক ফলাফল সবার সামনে প্রদর্শন করা হলো মাত্র।

গোধরার ঘটনায় ঘণ্টা কয়েকের মাথায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক নিখুঁত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে শুরু করে দিল। সরকারি হিসাবে মৃত্যের সংখ্যা ৮০০। নিরপেক্ষ সূত্র বলছে, ২ হাজারের বেশি লোক মারা গেছে। ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত দেড় লাখ লোক এখন উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করছে। মেয়েদের উলঙ্গ করে গণধর্ষণ করা হয়েছে। সন্তানের সামনে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে পিতাকে। ২৪০টি দরগা ও ১৮০টি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে—আহমেদাবাদে আধুনিক উর্দু কবিতার জনক ওয়ালি গুজরাতির মাজার ভেঙে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গীতশিল্পী উস্তাদ ফৈয়াজ আলি খাঁর কবর অপবিত্র করা হয়েছে। জ্বলন্ত টায়ার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে। দুষ্কৃতকারীরা দোকানপাট, বাড়িঘর, হোটেল, টেক্সটাইল মিল, বাস ও প্রাইভেটকারে লুটপাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার লোক চাকরি হারিয়েছে।

কংগ্রেসের সাবেক এমপি ইকবাল এহসান জাফরির বাড়ি ঘেরাও করেছিল উন্মত্ত লোকজন। পুলিশের মহাপরিচালক, পুলিশ কমিশনার, মুখ্য স্বরাষ্ট্র সচিব ও অতিরিক্ত সচিবকে ফোন করেও কোনো সাড়া পাননি তিনি। তার বাড়ির আশপাশে টহলরত ভ্রাম্যমাণ পুলিশভ্যান হস্তক্ষেপ করেনি। দুষ্কৃতকারীরা দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে। তারা তার মেয়েদের নগ্ন করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। তারা এহসান জাফরির শিরশ্ছেদ করে তার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলে। গত ফেব্রুয়ারিতে রাজকোট এলাকার বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে প্রচারাভিযানকালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন জাফরি। যোগসূত্রটি লক্ষণীয়।

গুজরাত জুড়ে হাজার হাজার লোক উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাদের হাতে পেট্রলবোমা, বন্দুক, চাকু, তলোয়ার এবং ত্রিশূল। ভিএইচপি ও বজরং দলের লুণ্ঠনবাদীরা ছাড়াও দলিত ও আদিবাসীরাও এতে অংশ নেয়। মধ্যবিত্তরা যোগ দেয় লুটপাটে। (অভূতপূর্ব এক দৃশ্য—এক পরিবার লুটপাট চালিয়ে একটি মিতসুবিশি ল্যান্সার নিয়ে বাসায় ফিরেছে।) দাঙ্গাবাজদের নেতাদের কাছে মুসলমানদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ব্যবসা বাণিজ্য, এমনকি পার্টনারশিপের কম্পিউটারে রক্ষিত তালিকা ছিল। হামলা সমন্বয়ের জন্য তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে ট্রাকে ট্রাকে গ্যাস সিলিন্ডার জমানো হয়েছে। এগুলো তারা ব্যবহার করেছে মুসলমানদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার কাজে। তারা শুধু পুলিশের মদদই পায়নি, পুলিশ তাদের রক্ষা করতে গুলি চালিয়েছে।

গুজরাত যখন জ্বলছিল, তখন এমটিভিতে প্রচার হচ্ছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কবিতা। জানা যায়, তার গানের ক্যাসেট লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। গুজরাতের দিকে নজর দিতে এক মাসেরও বেশি সময় এবং পাহাড়ি এলাকায় দু দফা অবকাশ যাপন করতে হয়েছে তাকে। যখন নজর দিলেন, তখন তার দৃষ্টি ঢাকা পড়ে গেল কম্পিত মোদির ছায়ায়। শাহ আলম উদ্বাস্তু শিবিরে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার মুখ নড়ল। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করতে চাইলেন। কিন্তু কোনো কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হলো না। কেবল পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া, রক্তাক্ত, চূর্ণবিচূর্ণ চরাচরের ওপর দিয়ে ঠাট্টার মতো শিস দিয়ে বয়ে গেল বাতাসের ঝাপটা। পরের দৃশ্যে তাকে সিঙ্গাপুরে একটি গলফ মাঠে ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনে ব্যস্ত দেখা গেল।

গুজরাতের পথে পথে এখন ঘাতকের পদধ্বনি। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ধারণ করে দিচ্ছে দাঙ্গাবাজরা। তারাই বাৎলে দিচ্ছে, কে কোথায় থাকতে পারবে না পারবে, কে কী বলতে পারবে, কে কার সঙ্গে কখন কোথায় দেখা করতে পারবে। তাদের ম্যান্ডেট দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপার ছাড়িয়ে এখন তারা নিদান দিচ্ছে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের, পারিবারিক কলহের। পানিসম্পদের পরিকল্পনা ও বরাদ্দও তারাই নির্ধারণ করে দিচ্ছে...(এ কারণেই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটেকরের ওপর হামলা চালানো হয়েছে)। মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হোটেলে মুসলমানদের বসতে দেওয়া হচ্ছে না। স্কুলে মুসলমানদের ছেলেমেয়েদের বাঁকা চোখে দেখা হচ্ছে। মুসলমান শিক্ষার্থীরা ভয়ে পরীক্ষায় বসতে পারছে না। মুসলমান পিতামাতাদের আশঙ্কা, যা শিখেছে সেটুকুও ভুলে যাবে তাদের ছেলেমেয়েরা। প্রকাশ্যে তাদের আব্বি, আম্মি সম্বোধন করতে নিষেধ করছে তারা। এভাবে সম্বোধন করা মানেই মৃত্যু ডেকে আনা। বলা হচ্ছে এ তো সবেমাত্র শুরু।

যে হিন্দু রাষ্ট্রের কথা প্রচার করা হচ্ছে, এটাই কি সেই রাষ্ট্রের রূপ? মুসলমানদের একবার 'তাদের রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার' ফলে কি এ দেশে দুধ আর কোকাকোলার নহর বয়ে যাবে? রামমন্দির নির্মাণ হয়ে গেলেই কি সবার গায়ে জামা আর উদরে রুটি জুটবে? প্রত্যেক চোখ থেকে কি উবে যাবে অশ্রু? আগামী বছর কি আমরা এ সাফল্যের একটা বার্ষিকী পালন করতে পারব? নাকি তখন ঘৃণা করার নতুন কোনো পাত্র বেরিয়ে আসবে? আদিবাসী, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, দলিত, পারসিক, শিখ—ঘৃণার তালিকায় তখন এরা কি আর বাদ পড়বে? কিংবা তারও পরে যারা জিন্স পরে, যারা ইংরেজি বলে, কিংবা যাদের পুরু ঠোঁট। কোকড়ানো চুল? খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না আমাদের। এ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি কি অব্যাহত থাকবে? শিরশ্ছেদ করা, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করা, মুখে মূত্রত্যাগ—এগুলো কি চালু হবে? মায়ের জরায়ু ছিঁড়ে ভ্রূণ বের করে কি তাকে হত্যা করা হবে?

তাদের পরিচয় যাই হোক বা যেভাবেই তারা নিহত হোক না কেন, গুজরাতে গত কয়েক সপ্তাহে নিহত প্রত্যেকটি মানুষের জন্য শোক করা উচিত।

সম্প্রতি জার্নাল ও পত্রপত্রিকায় শত শত ক্ষুব্ধ পাঠকের চিঠি আসছে। যাতে 'ছদ্ম সেক্যুলারিস্ট'দের প্রতি প্রশ্নবান ছুড়ে দেওয়া হয়েছে, গুজরাতের বাকি হত্যাকাণ্ডগুলোর ক্ষেত্রে তারা যতখানি ক্ষুব্ধ নিন্দা জানান, অতোখানি ক্ষোভ কেন সবরমতি এক্সপ্রেসের হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ে না। যারা এ প্রশ্ন করছেন তারা মনে হয় বুঝতেই পারছেন না গোধরার সবরমতি এক্সপ্রেস জ্বালিয়ে দেওয়া এবং গুজরাতে এখন যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটছে এ দুটোর মধ্যে একটি মৌলিক তফাৎ রয়েছে। গোধরার ঘটনার পেছনে কে দায়ী আমরা এখনো নিশ্চিত জানি না। কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই সরকার ঘোষণা করেছে, এটা আইএসআইয়ের ষড়যন্ত্র। নিরপেক্ষ সূত্র জানিয়েছে, বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রেনটিতে অগ্নিসংযোগ করে। যেভাবেই আগুন লাগানো হোক না কেন, এটা অপরাধমূলক কর্ম। ওদিকে প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ সূত্র জানিয়েছে, গুজরাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যা যা ঘটেছে—সরকারের ভাষায় যেগুলো ছিল তাৎক্ষণিক 'প্রতিহিংসামূলক' ঘটনা—তার সবই ঘটেছে প্রদেশ সরকারের প্রশ্রয়মূলক দৃষ্টির সামনে এবং সবচেয়ে যা জঘন্য ব্যাপার, সরকারের সক্রিয় মদদে। উভয়ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে। রাষ্ট্র তো জনগণের হয়ে কাজ করে। কাজেই রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, গুজরাত ষড়যন্ত্রে আমিও কোনো না কোনোভাবে সহযোগী হয়ে পড়েছি। আমার ক্ষোভের কারণ এখানেই। এ কারণেই দুই ধরনের হত্যাকাণ্ডের প্রকৃতি দুই রকম।

গুজরাতের গণহত্যার পর ব্যাঙ্গালোরে তাদের সম্মেলনে বিজেপির নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদিভূমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শুভেচ্ছা অর্জন করার আহ্বান জানাল মুসলমানদের প্রতি। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মোদি আরএসএসের সদস্য। গোয়ায় বিজেপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় নরেন্দ্র মোদিকে বীরের মর্যাদায় স্বাগত জানানো হলো। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে তার পদত্যাগের কৃত্রিম ইচ্ছা সর্বসম্মতিক্রমে খারিজ করে দেওয়া হলো। প্রকাশ্য জনসভায় তিনি গুজরাতের গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাবলিকে গান্ধীর 'ডান্ডি মার্চ'-এর সঙ্গে তুলনা করলেন। বললেন, তার মতে দুটোই স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত।

সমসাময়িক ভারতকে বিশ্বযুদ্ধপূর্ব জার্মানির সঙ্গে তুলনা করতে খারাপ লাগে। কিন্তু এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। (আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতারা তাদের লেখালেখিতে হিটলার ও তার পদ্ধতির প্রশংসা করতে কসুর করেননি)। দুটি পরিস্থিতির মধ্যে তফাৎ শুধু এটুকুই যে, এখানে ভারতে আমরা একজন হিটলারকে এখনো পাইনি। তার বদলে আমরা পেয়েছি এক ভ্রাম্যমাণ আনন্দোৎসব, এক ঘুরে বেড়ানো বাদ্যদল। আমরা পেয়েছি হাইড্রার মতো বহু মাথাবিশিষ্ট এক সংঘ পরিবার—বিজেপি, আরএসএস ভিএইচপি ও বজরং দল। তারা একেকজন বাজাচ্ছে একেক রকম বাদ্যি। এদের সবচেয়ে বড় প্রতিভা জনগণ যখন যা চায়, যে রকম চায়, সে রকম করে নিজেকে সর্বরোগহর হিসেবে উপস্থাপন করা।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সংঘ পরিবারের রয়েছে এক্কেবারে উপযুক্ত নেতৃত্ব। যে কোনো পরিস্থিতির উপযোগী বাগাড়ম্বরতায় পারদর্শী এক বৃদ্ধ কবি রয়েছেন তাদের। জনতাকে উন্মত্ত করে তোলার সিদ্ধহস্ত এক কট্টরপন্থী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় দেখার জন্য তারা পেয়েছে এক কোমল লতা, টিভির বিতর্ক সামাল দেওয়ার জন্য ইংরেজির তুবড়ি ছোটানো এক আইনজীবী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তারা জোগাড় করেছে ঠাণ্ডা মাথার এক খুনিকে। গণহত্যা চালানোর মতো শারীরিক খাটাখাটনির কাজ সামাল দেওয়ার জন্য রয়েছে বজরং দল ও ভিএইচপির তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীরা। এই দশাননের আবার রয়েছে একটি টিকটিকির লেজ। বিপদ দেখলেই এ লেজ খসে পড়ে। পরে আবার গজায়। ইনি আর কেউ নন, যেকোনো রূপ ধারণে পারঙ্গম এক সমাজবাদী নেতা, যিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর উর্দি পরে আছেন। ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে বলার মিশনে পাঠানো হয় তাকে। তার ডাক পড়ে যুদ্ধবিগ্রহ, ঘূর্ণিঝড় কিংবা গণহত্যার ঘটনা ঘটলেই। সঠিক বোতামে চাপ দিয়ে সঠিক সুরটি বাজানোর দক্ষতার জন্য তার খুব সুনাম পরিবারে।

ত্রিশূলের ঝঙ্কারের মতো বিচিত্র ভাষায় কথা বলতে পারে সংঘ পরিবার।

একই সঙ্গে একাধিক স্ববিরোধী কথা শোনাতে পারে এই পরিবার। তাদের একটি মাথা (ভিএইচপি) যখন তার লাখ লাখ ক্যাডারকে 'চূড়ান্ত সমাধানের' জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে, তখন তাদের নামসর্বস্ব শিরোমণি (প্রধানমন্ত্রী) জাতিকে এই বলে আশ্বস্ত করছেন যে, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখা হবে। 'ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবমাননা' করার দায়ে এরা একদিকে বই-পুস্তক, চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করতে পারে, চিত্রকর্ম পারে পুড়িয়ে ফেলতে, তেমনি অন্য দিকে তারাই আবার সারা দেশের পল্লী উন্নয়ন বাজেটের ৬০ শতাংশের সমান অর্থ এনরনের কাছে বন্ধক রাখে। এ পরিবারের মধ্যে নানারকম রাজনৈতিক মত একই সঙ্গে ভরে রাখা হয়েছে। এ কারণে যেসব বিষয় দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হওয়ার কথা সেটি এখন নিতান্ত 'পারিবারিক কলহ'। তাদের কলহ যত আক্রমণাত্মকই হোক না কেন, তারা সব সময় প্রকাশ্যে এসব কলহ করে। শেষে আন্তরিকভাবে বিপদভঞ্জন হয়। দর্শকরা এই সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যায় যে, পয়সা ওসুল হয়েছে—হাসি, কান্না, অ্যাকশন, ড্রামা, ষড়যন্ত্র, প্রতিশোধ, অনুতাপ, কাব্য এবং রক্তারক্তিতে ভরপুর এক নাটক দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। এটাই হলো 'সম্পূর্ণ বশীকরণের' স্বদেশী কৌশল।

কিন্তু যখন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ মিইয়ে আসে, মাথাগুলোর ঠোকাঠুকি নীরব হয়ে আসে তখন কান পাতলে শোনা যায় এ বিশৃঙ্খল নিনাদের ভেতর ধুকপুক করছে একটিমাত্র হৃদস্পন্দন। অহির্নিশি এক গেরুয়া চাহনিতে বিশ্ব দেখছে সকলে।

এর আগেও ভারতে বিভিন্ন অভিযান চালানো হয়েছে, সব রকমের অভিযান। সেসব অভিযানের লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট বর্ণ, গোষ্ঠী, সুনির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর নয়াদিল্লিতে ৩ হাজার শিখ নিধনযজ্ঞের নেতৃত্ব দেয় কংগ্রেস। সে হত্যাযজ্ঞের প্রতিটি মুহূর্ত গুজরাতের মতোই বীভৎস ছিল। সে সময় দুর্মুখ রাজীব গান্ধী বলেছিলেন, 'বড় বৃক্ষের পতন ঘটলে মাটি কেঁপে উঠবেই।' ১৯৮৫ সালে নির্বাচনে একতরফা বিজয় অর্জন করে কংগ্রেস। সে কি শুধুই সহানুভূতির জোয়ারের কারণে! তারপর ১৮ বছর পেরিয়ে গেছে। একটা লোকেরও শাস্তি হয়নি।

যেকোনো অস্থির রাজনৈতিক ইস্যুর কথা তুলুন—পারমাণবিক পরীক্ষা, বাবরি মসজিদ, তেহেলকা কেলেঙ্কারি, নির্বাচনে সুবিধা করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক উসকানি—দেখবেন আগে থেকেই নজির সৃষ্টি করে গেছে কংগ্রেস। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কংগ্রেস বীজ বুনে রেখে গেছে, আর বিজেপি ফসল তুলেছে ঘরে। কাজেই যখন ভোট দিতে যেতে বলা হয় আমাদের, আমরা কি এ দুপক্ষের মধ্যে তফাৎ দেখতে পাই? এর খুবই দ্বিধান্বিত অথচ অনিবার্য উত্তর হচ্ছে, 'হ্যাঁ, পার্থক্য আছে।' কারণ ব্যাখ্যা করা যাক। এ কথা সত্য যে, দশকের পর দশক ধরে কংগ্রেস পাপ করেছে। কিন্তু এ পাপকর্ম তারা করেছে রাতের আঁধারে। বিজেপি ওই কাজই করছে দিনের আলোয়। কংগ্রেস এ কাজ করেছে গোপনে, প্রতারণামূলকভাবে লজ্জাবনত চোখে। বিজেপি তা-ই করছে সগর্বে। এ তফাৎটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সংঘ পরিবার ম্যান্ডেটই পেয়েছে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা জাগিয়ে দেওয়ার। বছরের পর বছর ধরে এটাই তাদের লক্ষ্য ছিল। সুশীল সমাজের রক্তের মধ্যে এ ঘৃণা তারা স্লো-পয়জনিংয়ের মতো করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। দেশজুড়ে শত শত আরএসএসের শাখা এবং সরস্বতী শিশু মন্দির হাজার হাজার শিশু ও তরুণকে তাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। তাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে ধর্মীয় ঘৃণা আর মিথ্যে ইতিহাসের বীজ। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে তালিবানদের উত্থান ঘটানোর পেছনে দায়ী মাদ্রাসাগুলোর সঙ্গে এসব মন্দিরের কোনো তফাৎ নেই। এতটুকু কম বিপজ্জনক নয় এগুলো। গুজরাতের মতো রাজ্যে পুলিশ, প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্যাডারদের প্রত্যেকটি স্তরে সুপরিকল্পিতভাবে এসব লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা ব্যবস্থাটার মধ্যে একটি প্রবল ধর্মীয়, আদর্শিক রঙ মেখে দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় ক্ষমতা, এ জাতীয় প্রভাব একমাত্র রাষ্ট্রের মদদেই সম্ভব।

নিরন্তর চাপের মুখে যা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তা হলো, মুসলমান সম্প্রদায় বস্তি এলাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের জীবন বেছে নেবে। সার্বক্ষণিক আতঙ্কের ভেতর বসবাস করবে তারা। নাগরিক অধিকার থাকবে না তাদের। ন্যায়বিচারের প্রতিও থাকবে না তাদের কোনো আস্থা। তাদের সেই জীবনযাপন কেমন দাঁড়াবে? যেকোনো ক্ষুদ্র ঘটনা—সিনেমার টিকেট কাটার লাইনে সামান্য কথা কাটাকাটি, কিংবা গাড়ির আলো গায়ে পড়া নিয়ে মৃদু বচসা হলেই জান খতম। কাজেই তারা একেবারে চুপ মেরে যাওয়া শিখে নেবে। এটাকেই মেনে নেবে নিয়তি বলে। সমাজের পরিধির দিকে সরে যাবে তারা। তাদের সন্ত্রস্ত ভাব অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মাঝেও ছড়িয়ে পড়বে। অনেকেই, বিশেষত তরুণরা হয়তো জঙ্গিদের দিকে ঝুঁকে পড়বে। ভয়ানক কাজকর্ম করবে তারা। সেসবের নিন্দা জানানোর জন্য সুশীল সমাজের লোকজনকে ভাড়া করা হবে। তারপর প্রেসিডেন্ট বুশ তার কামানের নল আমাদের দিকে তাক করে বলবে, 'হয় তোমরা আমাদের সঙ্গে আছো, নইলে তোমরা সন্ত্রাসবাদী।'

বুশের এ বাণী সময়ের শরীরে গেঁথে গেছে তুষারিকার মতো। ভবিষ্যতের দিনগুলোয় কসাই আর গণহত্যাকারীরা এসব তুষারিকায় তাদের চোয়ালের সাইজ অনুযায়ী কামড় বসিয়ে কসাইগিরি জায়েজ করবে।

শিবসেনার বাল ঠাকরে ইদানীং মোদির কীর্তিকলাপে উৎসাহিতবোধ করছেন। তিনি একটি স্থায়ী সমাধান দিয়েছেন। তিনি গৃহযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। নিখুঁত বুদ্ধি নয়? তাহলে তো পাকিস্তানকে আর কষ্ট করে আমাদের ওপর বোমাবর্ষণ করতে হবে না। আমরাই বোমা মেরে আমাদের দফারফা করে ফেলব। আসুন পুরো ভারতটাকেই আমরা কাশ্মীর বানিয়ে ফেলি। কিংবা বসনিয়া। কিংবা ফিলিস্তিন। অথবা রুয়ান্ডা। চলুন, সবাই মিলে আজীবন অশান্তিতে ডুব দিই। একে অপরকে হত্যা করার জন্য চলুন দামি বন্দুক ও বিস্ফোরক কিনি। আসুন, আমাদের ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্তের ধারায় ভারি করে তুলি আমেরিকান ও ব্রিটিশ অস্ত্র ব্যবসায়ীদের পকেট। যে কার্লাইল গ্রুপের শেয়ারহোল্ডার বুশ ও লাদেন পরিবার, সেই গ্রুপের কাছে আমরা বিশেষ মূল্য ছাড় দাবি করতে পারি। সবকিছু ভালোমতো চললে আমরা হয়তো একদিন আফগানিস্তানে পরিণত হবো। (তাছাড়া দেখুন না, কী রকম ঈর্ষণীয় পাবলিসিটি পেয়েছে তারা!) যখন আমাদের সবগুলো ক্ষেতখামার মাইনে গিজগিজ করবে, আমাদের দরদালান যখন সব ধুলায় মিশে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে আমাদের অবকাঠামো, আমাদের শিশুরা শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়বে, মানসিকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে, যখন স্বতোৎপাদিত ঘৃণার স্রোতে আমরা আমাদের প্রায় মুছে ফেলার উপক্রম করব, তখন হয়তো আমরা আমেরিকার কাছে সাহায্যের আবেদন জানাব। বলব, বিমানে করে আমাদের মাথার ওপর খাদ্য বর্ষণ করার মতো কেউ কি আছো?

আত্মবিনাশের কী এক খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। আরেক ধাপ পা বাড়ালেই অতলে সাঁই সাঁই পতন। সরকার পেছন থেকে সেদিকেই ঠেলছে ক্রমাগত। গোয়ায় বিজেপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি ইতিহাস তৈরি করেছেন। তিনি প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চৌকাঠ অতিক্রম করেছেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক অবিবেকী অন্ধবিশ্বাস সবার সামনে উন্মোচন করেছেন তিনি। বলেছেন, 'মুসলমানরা যেখানেই থাকুক না কেন, তারা শান্তিতে থাকতে চায় না।'

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ একটি সাদামাটা আশা পুষে রেখেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম, গত কয়েক সপ্তাহের আতঙ্কের ভয়াবহতা বিক্ষুব্ধ সেক্যুলার দলগুলোকে একাট্টা করবে। বিজেপি এককভাবে ভারতের জনগণের ম্যান্ডেট পায়নি। হিন্দুত্ব প্রকল্পের ম্যান্ডেট তাদের দেয়নি জনগণ। আমরা আশা করেছিলাম কেন্দ্রে

বিজেপির নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশনের ২৭ শরিক তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করবে। বোকার মতো আমরা ভেবেছিলাম বিজেপি এবার টের পাবে নৈতিকতার কত বড় পরীক্ষার মুখে পড়েছে তারা।

সময়ের অশনি সঙ্কেত ধ্বনিত হয়েছে। বিজেপির একটি শরিক দলও পদত্যাগ করেনি। পদত্যাগ করলে কোন আসন থাকবে আর কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে—সেই মানসাঙ্ক কষার দূরবর্তী চাহনি দেখা গেল প্রতিটি চতুর চোখে। একমাত্র এইচডিএফসির দীপক পারেখ ছাড়া ভারতের করপোরেট সম্প্রদায়ের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকেও দেখলাম না নিন্দা জানাতে। ভারতের একমাত্র বিশিষ্ট মুসলমান রাজনীতিবিদ কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ মোদিকে সমর্থন করে সরকারের সঙ্গেই পাত পেতেছেন। কেননা খুব শিগগিরই ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার বাসনা মনের ভেতর পুষছেন তিনি। সবচেয়ে খারাপ ঘটনা হলো, নিম্নবর্ণের একমাত্র ভরসার স্থল মায়াবতী উত্তর প্রদেশে বিজেপি সরকারের সঙ্গে কোয়ালিশন গড়ার উপক্রম করেছেন।

কংগ্রেস ও বাম দলগুলো মোদির পদত্যাগের দাবিতে গণআন্দোলনের ডাক দিয়েছে। পদত্যাগ? আমরা কি পরিমিতিবোধ হারিয়ে ফেলেছি নাকি? পদত্যাগ তো অপরাধীদের শাস্তি নয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার কথা। বিচার করে তাদের সাজা হওয়ার কথা। গোধরায় যারা ট্রেনে আগুন দিয়েছে শাস্তি তাদেরও হওয়া উচিত। বিচার হওয়া উচিত গুজরাতে অভিযানের পরিকল্পনাকারী উচ্ছৃঙ্খল লোকজন এবং তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর। সুপ্রিম কোর্ট চাইলেই মোদি, বজরং দল ও ভিএইচপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো জারি করতে পারে আদালত। হাজার হাজার বয়ান পাওয়া যাবে। লাখো লাখো সাক্ষী সাক্ষ্য দেবে। গুজরাতে যা ঘটেছে তাতে অনেকের আতঙ্কের ঘোর এখনো না কাটলেও এদিকে মন্ত্রণাপ্রাপ্ত হাজার হাজার তরুণ আতঙ্কের আরো গভীরে তলদেশ খুঁড়ে বের করতে উদ্যত। চারদিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখতে পাবেন ক্ষুদ্র পার্ক, বৃহৎ ময়দান, গ্রাম্য পঞ্চায়েতে আরএসএস তার গেরুয়া ঝাণ্ডা উড়িয়ে পা-পা করে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ চোখের পলকে তারা সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তরুণরা এখন সোমত্ত পুরুষ। খাকি প্যান্ট পরে তারা মার্চ করছে তো করছেই। কোথায়? কেন? ইতিহাসের প্রতি অনীহার কারণে তারা জানতে পারছে না ফ্যাসিবাদের আস্ফালন খণ্ডকালের। এক সময় নিজের বোকামিতে নিজের ধ্বংস ডেকে আনে ফ্যাসিবাদ।

পার্লামেন্টে নিন্দা জানিয়ে মানুষের মনে ঘৃণা আর ক্ষোভের জোয়ার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। ভ্রাতৃত্ব আর প্রেমের মন্ত্র শ্রুতিমধুর হলেও এগুলোই যথেষ্ট নয়।

ইতিহাস বলে জাতিগত হতাশা, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম। ভারতে ফ্যাসিজম এসেছে একের পর এক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কার স্বপ্নগুলোকে ঝাঁঝরা করে দেওয়ার কারণে।

ভারতের স্বাধীনতা এসেছেই রক্তের পথ বেয়ে। দেশভাগের সময় নিহত হাজার হাজার মানুষের রক্তের দাগ লেগে রয়েছে স্বাধীনতার গায়ে। অর্ধশতাব্দীকাল ধরে এই ঘৃণা আর পারস্পরিক অবিশ্বাস বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতিবিদরা এ ঘৃণা নিয়ে খেলতে চেয়েছেন। ক্ষত সারানোর কোনো চেষ্টা তারা করেননি। এ খেলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন মিসেস ইন্দিরা গান্ধী। প্রতিটি রাজনৈতিক দল আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় গণতন্ত্রের মজ্জা শুষে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। নির্বাচনে সুবিধা করার খাতিরে তারা এর শরীর খুঁড়েছে। উইপোকার মতো তারা এর ভেতরে সুড়ঙ্গ করেছে। মাটির তলায় করেছে রাস্তাঘাট। এভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র অর্থকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে ফাঁপা খোলসে পরিণত করেছে। তাদের খোঁড়াখুঁড়ি সংবিধান, পার্লামেন্ট ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সুতোর বন্ধন কেটে দিয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের চেক অ্যান্ড ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতে ১৩ কোটি মুসলমানের বাস। হিন্দু ফ্যাসিবাদীরা তাদেরকে বৈধ শিকার বলে গণ্য করে। মোদি ও বাল ঠাকরে কি মনে করেন গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে মুসলমান নিধন শুরু করলে সারা বিশ্ব তা চেয়ে চেয়ে দেখবে? পত্রিকার খবরে প্রকাশ, গুজরাতের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তারা এটিকে নাৎসি শাসনের সঙ্গে তুলনা করেছে। ভারত সরকারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া—ভারতের মিডিয়া ব্যবহার করে ভারতেরই 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে' মন্তব্য করতে দেওয়া হবে না বিদেশীদের। এরপর কী? সেন্সরশিপ? ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া? আন্তর্জাতিক ফোন কল বন্ধ করে দেওয়া? ভুল 'সন্ত্রাসবাদীদের' হত্যা করার পর ডিএনএ নমুনা নিয়ে ছোটাছুটি? রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চেয়ে বড় কোনো সন্ত্রাস হয় না।

কিন্তু এদের থামাবে কে? একমাত্র বিরোধী দলের সোচ্চার প্রতিরোধই এদের ফ্যাসিবাদী জোশকে রুখতে পারে। এখন পর্যন্ত বিহারের লালু যাদবই নিজের আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি বলেছেন, কৌন মাই কা লাল কেহতা হ্যায় কে ইয়ে হিন্দু রাষ্ট্র হ্যায়? উসকো ইয়াহা ভেজ দো, ছাত্তি ফাড় দুঙ্গা। (কোন মায়ের পুত বলে রে এটা হিন্দু রাষ্ট্র? পাঠিয়ে দে তাকে এখানে, বুকের ছাতি গুঁড়িয়ে দিই।)

দুর্ভাগ্য যে, সবকিছু ঠিক করে ফেলার সহজ কোনো পথ নেই। ফ্যাসিজম উৎখাত করা সম্ভব কেবল এর দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষগুলো যদি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি দ্বিগুন জোরদার অঙ্গীকার প্রদর্শন করে।

আমরা কি আমাদের নিজ নিজ প্রাচীর ডিঙিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত? আমরা কি লাখে লাখে কাতারে কাতারে শুধু রাস্তায় নয়, কর্মস্থলে, স্কুলে, বাড়িতে, প্রত্যেক সিদ্ধান্তে মিছিলে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত?

নাকি এখনো প্রস্তুত নই...

যদি প্রস্তুত না হয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে আজ থেকে বহু বছর পরে, যখন বাকি বিশ্ব হিটলারের জার্মানির নাগরিকদের মতো আমাদেরও এড়িয়ে চলতে শুরু করবে, তখন আমরাও আমাদের মানবসন্তানদের চোখে ঘৃণার ছায়া চিনে নিতে শিখব। আমরাও আমাদের সন্তান-সন্ততির চোখের দিকে তাকাতে পারব না লজ্জায়। যে কাজ আমরা করেছি এবং যা করতে পারিনি—তার লজ্জা। যা আমরা ঘটতে দিয়েছি, তার লজ্জা।

ভারতে এই হলো আমাদের পরিস্থিতি। এ রাত্রি অবসানে ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।

আউটলুক, ৬ মে ২০০২

প্রামান্যচিত্রের আন্তর্জাতিক উৎসবে

শাহাদুজ্জামান

হল্যান্ডের রাজধানী আমস্টার্ডামে সম্প্রতি শেষ হলো বার্ষিক আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টারি উৎসব ইডফা—ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্টারি ফেস্টিভ্যাল অফ আমস্টার্ডাম। ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে বিশেষ সম্মানজনক এ উৎসবে ৫০টি দেশের প্রায় ৩০০ ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হলো। আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী নির্বাচন করলেন উৎসবের শ্রেষ্ঠ পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য ডকুমেন্টারি দুটোকে। এছাড়াও পুরস্কৃত করা হলো চলচ্চিত্র সমালোচকদের নির্বাচিত এবং দর্শকদের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ দুটো ডকুমেন্টারিকেও। প্রতিযোগিতার বাইরে ছিল কিছু বিষয়ভিত্তিক ডকুমেন্টারির পৃথক আসর। এতে ছিল চীনবিষয়ক ডকুমেন্টারি, শিশুতোষ ডকুমেন্টারি ইত্যাদি। শহরের প্রধান তিনটি প্রেক্ষাগৃহে বিপুল দর্শক সমাগমে উৎসব চলল দশ দিনব্যাপী।

আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচডি সন্দর্ভ রচনার সুবাদে এ শহরে আছি গত কয়েক মাস। ফলে উৎসবের বেশ কিছু ডকুমেন্টারি দেখার সুযোগ হলো। বিপুল সংখ্যক ডকুমেন্টারির মধ্য থেকে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়সূচির ফাঁকে গোটা পঁচিশেক ডকুমেন্টারি দেখার সুযোগ করে নিয়েছিলাম। নানা দেশের নানা পটভূমিতে বিচিত্র বিষয়ের সব ডকুমেন্টারি। দেখা সেই সব ডকুমেন্টারিগুলোর একটা পরিচয় রইল নিচে।

কপট আমেরিকা

এ উৎসবে বেশ কয়েকটি ডকুমেন্টারি ছিল বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকার কপট ভূমিকা এবং আমেরিকার নাগরিক জীবনের সংকট নিয়ে। ১১ সেপ্টেম্বরের পরিপ্রেক্ষিতে এই ডকুমেন্টারিগুলো দর্শকদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।

আমেরিকান পরিচালক কাদাজিয়ান তৈরি করেছেন *দি আমেরিকান ডিলেমা* ছবিটি। আমেরিকান জীবনের নানা ইমেজ এবং নানা স্তরের মানুষের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরী ডকুমেন্টারিতে পরিচালক আমেরিকান জীবনের ঘোর আত্মিক শূন্যতার দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একজন সাক্ষাৎকারে বলছেন, গ্রিকরা মানুষকে বলেছিল 'হোমো স্যাপিয়্যানস' অর্থাৎ 'জ্ঞানসন্ধানী প্রাণী'। আর আমেরিকা মানুষকে বানিয়েছে 'হোমো ইকোনোমিকাস' অর্থাৎ কিনা 'টাকাসন্ধানী প্রাণী'। আরেকজন বললেন, আমরা আমেরিকানরা চাঁদে যেতে পারি কিন্তু নিজের ছেলের সঙ্গে দু দণ্ড বসে কথা বলতে পারি না। আমেরিকার সমাজ ভয়ঙ্কর এক আত্মিক শূন্যতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, পরিচালক তার এ আশঙ্কা চমৎকারভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন ডকুমেন্টারিটিতে।

অস্ট্রেলিয়ার পরিচালক ক্রিস হিলটন তৈরি করেছেন *শ্যাডো প্লে* নামের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ডকুমেন্টারি। তার ডকুমেন্টারির বিষয় ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট-নিধন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের বাইরে সে সময় পৃথিবীর বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টি ছিল ইন্দোনেশিয়ায়। ১৯৬৫ সালে এক হত্যাকাণ্ডে ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনীর ছয়জন জেনারেল নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে সে দেশে দুই লাখেরও বেশি কম্যুনিস্টকে হত্যা করা হয়। এ প্রক্রিয়ার মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা সুকর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং জেনারেল সুহার্তো ক্ষমতা গ্রহণ করে তিন দশকের বেশি সময় দখলে রাখেন। পরিচালক ক্রিস হিলটন দীর্ঘদিন গবেষণা করে বহু ঐতিহাসিক নথি, তথ্য ফুটেজের মাধ্যমে এই কম্যুনিস্ট-নিধনের পেছনে আমেরিকার সিআইএ-র সরাসরি যোগাযোগটিকে প্রমাণ করেছেন। দেখিয়েছেন ব্রিটেন এবং অস্ট্রেলিয়ারও পরোক্ষ মদদ। এই ডকুমেন্টারিতে প্রথমবারের মতো ইন্দোনেশিয়ার বহু মানুষ তাদের সে সময়কার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে ব্যবহৃত হয়েছে বহু ঐতিহাসিক ফুটেজ। ডকুমেন্টারিটিতে বর্ণনার কৌশল হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় লোকশিল্প ছায়ানাটককে। ছায়ানাটকের পুতুলকে যে নাচায়, সে তো থাকে আড়ালেই।

সুইডিশ পরিচালক টোরবিয়র্নসনের ডকুমেন্টারি *দি লাভার্স অফ সান ফারনান্দো*। প্রেক্ষাপট নিকারাগুয়া। নিকারাগুয়ার সান্দানিস্তা বিপ্লব ও তার বিপরীতে আমেরিকার মদদপুষ্ট কন্ট্রা; অবশেষে বিপ্লবের পতন। আমেরিকার পাকচক্রে লাতিন আমেরিকার এ দেশটির রাজনীতির ঘূর্ণি। কিন্তু পরিচালক নিকারাগুয়ার এই রাজনীতিকে দেখেছেন ভিন্ন এক পরিপ্রেক্ষিত থেকে। তিনি তার পরিচিত এক নিকারাগুয়ান দম্পতিকে ক্যামেরাবন্দি করেছেন দীর্ঘ প্রায় বিশ বছর। দেশের রাজনীতির পালাবদলের পটভূমিতে কী করে তীব্র ভালোবাসাতাড়িত এক দম্পতির জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গেল তার মর্মস্পর্শী প্রামাণ্য দলিল এ ছবিটি।

স্পেনের পরিচালক মানুয়েল মার্তিন কোয়েনকার ছবির নাম *দি কিউবান গেম*। কিউবা ও আমেরিকা উভয় দেশের জনপ্রিয় খেলা বেসবল। একটি খেলা কী করে দু দেশের রাজনৈতিক মর্যাদার লড়াইয়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল তারই বিবরণ এ ডকুমেন্টারিটি। ১৯৫৯ সালে বিপ্লবের পর ফিদেল কাস্ত্রো কিউবার জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার একটি মাধ্যম হিসেবে নিয়েছিলেন বেসবলকে। আমেরিকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বেসবল প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে কিউবাকে উপস্থাপনের জন্য কাস্ত্রো এক শক্তিশালী বেসবল দল তৈরির প্রস্তুতি নেন। নিজে রাত জেগে উপস্থিত থাকতেন সে দলের প্রশিক্ষণে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য কিউবান দল আমেরিকার উদ্দেশে রওনাও দেয়। কিন্তু আমেরিকা নানা প্রতারণার পথে কিউবাকে প্রতিযোগিতা থেকে বাতিলের ব্যবস্থা করে। সেই ঘটনাবলি নিয়েই এই ছবি। বাড়তি পাওনা হিসেবে ছিল যুবক বয়সে দেখা ফিদেল কাস্ত্রোর অনন্যসাধারণ কিছু বক্তৃতার দুর্লভ ফুটেজ।

ইরানি ডকুমেন্টারি

ইরানি চলচ্চিত্র সম্প্রতি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র অঙ্গনে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। আব্বাস কিয়ারোস্তামি, মোহসেন মাখমালবাফ প্রমুখ ইরানি পরিচালক বিশ্ব প্রেক্ষাপটে অন্যতম পরিচালক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। আটপৌরে জীবন, অপেশাদার অভিনেতা, ফিকশন ও ডকুমেন্টারির মিশ্রণ ঘটিয়ে ইরানি চলচ্চিত্র নতুন এক ধারার সূচনা করেছে। ফলে উৎসবের শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য ডকুমেন্টারি হিসেবে ইরানি পরিচালক মোহসেন আবদেল ওয়াহাবের *ওয়াইভস অফ হাজি আব্বাস*-এর পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারটি তেমন অপ্রত্যাশিত ছিল না। মৃত হাজি আব্বাসের দুই বিধবা স্ত্রীর জীবন নিয়ে এই ডকুমেন্টারি। দুজনই সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা। হাজী আব্বাস নপুংসক হওয়ার কারণে তারা নিঃসন্তান। একই বাড়ির দুই কক্ষে থাকেন প্রায় চলৎশক্তিহীন দুই বৃদ্ধা। ছোট স্ত্রী প্রায় ভূতের মতো এখনো বড় স্ত্রীর আজ্ঞা পালন করেন, বাড়ির ছোটখাটো জিনিসের মালিকানা নিয়ে ঝগড়া করেন। একটি কারুকার্যখচিত থালা হাজি আব্বাস বড় স্ত্রী না ছোট স্ত্রীর জন্য কিনেছিলেন সেটি মীমাংসা করতে তুমুল বিতণ্ডা বাধে। আবার একজনের অসুস্থতায় অন্যজন সুস্থতা কামনায় জায়নামাজে মোনাজাত করতে বসেন। দুই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার ভালোবাসা এবং ঘৃণার সম্পর্ক কৌতুক ও মমতা মিশিয়ে চমৎকার তুলে ধরেছেন পরিচালক।

ইরানের অপর ছবি মাজিয়ার বাহারির *ফুটবল ইরানিয়ান স্টাইল*-এর বিষয়ও কৌতূহলোদ্দীপক। ইরানে মেয়েদের ফুটবল স্টেডিয়ামে যাওয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু ইরানে রয়েছে অসংখ্য ফুটবলভক্ত তরুণী। তরুণীরা টিভিতে ফুটবল দেখে। ছদ্মবেশে স্টেডিয়ামে ঢুকে যায়, প্রিয় ফুটবলারদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে, প্রশিক্ষণের সময় গিয়ে ফুল দিয়ে আসে। ফুটবলের মধ্য দিয়ে ইরানি নারীদের জীবনকে তুলে ধরার প্রয়াসটি বেশ অভিনব।

জিবা মীর হোসাইনি এবং কিম লোগিনোত্তোর ডকুমেন্টারি *রান এওয়ের* বিষয় ইরানের ঘরপালানো মেয়েরা। তেহরানের এক পুনর্বাসন কেন্দ্রে শহরের নানা প্রান্ত থেকে ঘরপালানো মেয়েরা এসে জড়ো হয়। কেউ স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, কেউ বাবা বা মায়ের অত্যাচারে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় এ কেন্দ্রে। ইরানি সমাজের নানা মাত্রা ফুটে ওঠে একেকটি মেয়ের কাহিনীর মধ্য দিয়ে। সেই সঙ্গে লক্ষণীয় এদের জীবনকে স্বাভাবিক করে তোলার রাষ্ট্রীয় তৎপরতাও।

এক সময় পারস্য সভ্যতার প্রভাব ছিল বিশ্বব্যাপী। কিন্তু নানা ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক চড়াই-উৎরাইয়ে পারস্য সংস্কৃতি তার জৌলুস হারিয়েছে। এখনো এ অঞ্চল নানাভাবে অবরুদ্ধ, রাজনীতির কবলে। কিন্তু এর মধ্যেই ইরানি চলচ্চিত্রকারেরা বিশ্বমঞ্চে নতুন করে স্থান দখল করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উৎসবের বাইরে ভিন্ন একটি প্রেক্ষাগৃহে চলতে থাকা প্রখ্যাত ইরানি পরিচালক মোহসেন মাখমালবাফের*কান্দাহার* ছবিটিও এ সময় দেখা হলো। আফগানিস্তান নিয়ে সাম্প্রতিক তোলপাড়ের মাত্র কয়েক মাস আগে ছবিটি নির্মাণ করেছেন তিনি। এত দ্রুত প্রেক্ষাপট বদলে যাবে, হয়তো তিনিও ভাবেননি। ছবিতে কানাডাপ্রবাসী এক আফগান নারী সাংবাদিক রওনা দেয় কান্দাহারের পথে, যেখানে সে রেখে এসেছে তার বোনকে। বোন তাকে চিঠি লিখেছে তালেবান শাসনের দেশে সে আর বেঁচে থাকতে চায় না। আগামী চন্দ্রগ্রহণের রাতে সে আত্মহত্যা করবে। কানাডাপ্রবাসী বোন তাই যে করে হোক কান্দাহারে পৌঁছাতে চায় চন্দ্রগ্রহণের আগে। কান্দাহারের পথে এই যাত্রাই ছবিটির বিষয়। এই যাত্রাপথেই আমরা দেখি সাম্প্রতিক আফগান জীবন। বর্ণাঢ্য বোরখার আড়ালে অদৃশ্য আফগান নারী, শিশুরা শিখছে স্থলমাইন থেকে দূরে থাকার কৌশল, কিশোররা অস্ত্র হাতে কোরান পড়ছে মাদ্রাসায়। স্থলমাইনে উড়ে যাওয়া পা-বিহীন অগণিত যুবক লড়াই করছে সীমিত সংখ্যক কৃত্রিম পা সংগ্রহের জন্য। বিমান থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্যারাসুটে করে নিচে ছুড়ে দিচ্ছে এক একটি কৃত্রিম পা। নীল আকাশের গায়ে অদ্ভুতভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে কয়েকটি কৃত্রিম পা আর নিচে সেই গুটিকয় পা সংগ্রহের জন্য চারদিক থেকে ক্রাচে ভর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে আসছে অসংখ্য পা-বিহীন মানুষ। প্রায় পরাবাস্তব এ দৃশ্য কিছুতেই মন থেকে মোছা যায় না।

প্যালেস্টাইন আর ইসরাইল

পৃথিবীর গায়ে লেপ্টে থাকা আরেকটি ক্ষত হচ্ছে ইসরাইল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধ। এ উৎসবে বেশ কয়েকটি ডকুমেন্টারি ছিল, যার বিষয় প্যালেস্টাইন-ইসরাইল সম্পর্ক।

প্যালেস্টাইনি পরিচালিকা আজ্জা এল হাসান তার *জামান আল আকবার* ডকুমেন্টারিটিতে ক্যামেরাবন্দি করেছেন আতঙ্কিত শহর রামাল্লার জীবন। ইসরাইলি হামলার ভয়ে এক এক করে বাড়ি ছাড়ছে মানুষ। এখানকার শিশুদের প্রিয় খেলা নকল বন্দুক হাতে যুদ্ধ করা। শিশুদের গল্পের বিষয় রক্ত, মৃতদেহ, বোমা।

অন্যদিকে ইসরাইলি পরিচালক এলোনা এরিয়েল এবং মোনাহেম তুলে ধরেছেন ইসরাইলি প্রেক্ষাপট। তাদের ছবির নাম *ইটস অ্যাবাউট টাইম*। সময় বিষয়ে ইসরাইলি নানা স্তরের মানুষের ভাবনা। একজন ইসরাইলি বলেন, লোকে ইতিহাস পড়ে বইয়ের পাতায় আর আমরা ইতিহাসের ভেতর বাস করি। আমরা প্রতিদিন ইতিহাস তৈরি হতে দেখছি। টিভি কিংবা রেডিওর খবর ইসরাইলি জীবনের একটি প্রধান উপাদান। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তারা কান পাতে খবরে। কারণ প্রতি ঘণ্টায় ইতিহাস তৈরি হচ্ছে এখানে। একজন বলছেন, দুই খবরের মাঝখানের সময়টুকুই আমাদের জীবন। অন্যদিকে অপর ইসরাইলি পরিচালক ডোভ গিলহার তৈরি করেছেন ভিন্ন এক ডকুমেন্টারি। জাপান সরকার এই দু দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের এ ধরনের পদক্ষেপ হিসেবে দশ জন নেতৃস্থানীয় ইসরাইলি পেশাজীবী ও দশজন প্যালেস্টাইনি পেশাজীবীকে টোকিওতে নিমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রণের শর্ত হচ্ছে দু সপ্তাহ দু দেশের এই বিশজন মানুষ একসঙ্গে থাকবেন, খাবেন, পরস্পর মতবিনিময় করবেন। পরিচালক এই নিমন্ত্রণের অভিজ্ঞতাকে ক্যামেরায় তুলে ধরেছেন। নাম দিয়েছেন মজার *স্লিপিং উইথ দি এনিমি*। আজীবনের শত্রুর সঙ্গে একই ঘরে ঘুমানো। নিজ দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে দুই শত্রু দেশের অধিবাসী সপ্তাহ দুয়েক একত্রে বসবাস করতে গিয়ে অন্যরকম মানুষ হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে মানবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তারা যখন যার যার দেশে ফিরে যায় তখন আবার বাইরের আর ভেতরের নানাবিধ চাপে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে শত্রুতা। এক কলঙ্কজনক পাকচক্রে বাধা পড়ে গেছে যেন দেশ দুটি।

জীবনী

দেখা ছবির তালিকায় ছিল বেশ কয়টি জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টারি। মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর জীবনভিত্তিক ডকুমেন্টারি লিওন গাস্টের *হোয়েন উই ওয়্যার কিংস* উল্লেখযোগ্য। শুধু চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে নয়, ব্যক্তিজীবনের নানা চমৎকারিত্বের কারণেও জীবিত কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন আলী। তার ধর্ম ও নাম পরিবর্তন, আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষে সোচ্চার হওয়া, ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে আমেরিকান সরকারের বিপক্ষে দাঁড়ানো, নানা বুদ্ধিদীপ্ত কথায় সাংবাদিকদের নাজেহাল করার ক্ষমতা মিলিয়ে বর্ণাঢ্য আলীর জীবন। সত্তর দশকে জায়ারের রাজধানী কিনসাসায় আলী এবং জর্জ ফোরাম্যানের বিখ্যাত লড়াইয়ের পূর্বাপর ঘটনার ফুটেজ ছাড়াও আলীর জীবনের নানা কৌতূহলোদ্দীপক মুহূর্তের ফুটেজ রয়েছে এ ডকুমেন্টারিতে।

স্লোভেনিয়ার পরিচালক জানজা গ্লোগোভেক তৈরি করেছেন যুগোস্লাভিয়ার প্রয়াত নেতা মার্শাল টিটোর জীবন নিয়ে ছবি। পরিচালক ব্যক্তি টিটোর পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এমন কিছু মানুষের যারা টিটোকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। যেমন, তার বাবুর্চি, দর্জি, সেক্রেটারি প্রমুখ। জানা গেল, বিশালবপু টিটো ছিলেন ভোজনরসিক, ছিলেন পোশাকের ব্যাপারে অতিসচেতন আর এও জানা গেল যে তিনি ছিলেন মহা ফিল্মভক্ত। ছিলেন এলিজাবেথ টেলরের অনুরাগী। কাজের শেষে প্রজেক্টরে দেখতে বসতেন এলিজাবেথ টেলরের ছবি। টিটোর জীবনের বেশ দুর্লভ কিছু ফুটেজ দেখা গেল এ ডকুমেন্টারিতে। ষাট দশকে জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টারি নির্মাতা হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন আমেরিকার মেহজেলস ব্রাদার্স। দেখলাম তাদের তৈরি ডকুমেন্টারি *মিট মার্লোন ব্রান্ডো*। ছবিটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে শুধু প্রখ্যাত হলিউডি তারকা মার্লোন ব্র্যান্ডোর জীবনীকেই তুলে ধরা হয়নি, দেখানোর চেষ্টা রয়েছে কী করে ব্র্যান্ডো একটি পণ্যে পরিণত হয়েছেন এবং নিজে চেষ্টা করছেন সে অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে।

জীবনীভিত্তিক অপর ডকুমেন্টারি ছিল আমেরিকাপ্রবাসী পিয়ানোবাদক ভ্লাদিমির হোরোউইৎজের ওপর। বয়োবৃদ্ধ এই পিয়ানোবাদকের মোজার্ট বাজানোর মহড়া এবং রেকর্ডিং ক্যামেরাবন্দি করেছেন শার্লোট জেরিন ও তার দল। শিশুর সারল্যে ভরা এই মানুষটি কেমন সুরের ভেতর আকণ্ঠ ডুবে আছেন তা দেখা গেল।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ

একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ডকুমেন্টারি নির্মাণ করেছেন কয়েকজন পরিচালক। কিন্তু নির্মাণের গুণে তা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। উৎসবের শ্রেষ্ঠ পূর্ণদৈর্ঘ্য ডকুমেন্টারির পুরস্কার পেয়েছেন ডেনমার্কের পরিচালক সামি সাফি তার *ফ্যামিলি* ছবির জন্য। সামি সাফি নিজেই এই ডকুমেন্টারির বিষয়। সাফির চার বছর বয়সে সাফির ইয়েমেনি বাবা তার ডেনিস মা এবং এক বড় ভাইকে রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এরপর তার পরিবারের সঙ্গে তার বাবার কোনো যোগাযোগ ছিল না। পঁচিশ বছর পর কাছাকাছি সময় সাফির মা মারা যায় এবং বড় ভাই আত্মহত্যা করে। একা হয়ে পড়ে সাফি এবং বাবাকে খুঁজে পাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পঁচিশ বছর পর নিজের বাবাকে আবিষ্কারের এই অভিযানই ডকুমেন্টারির বিষয়। নানা কৌশলে অচেনা ইয়েমেনের ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে শেষ পর্যন্ত দেখা হয় বাবার সঙ্গে। চমৎকার সম্পাদনায় নিজের ব্যক্তিগত এই আবেগকে পরিচালক

দর্শকদের মধ্যে সঞ্চালিত করতে পেরেছেন। তবে ছবিটিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়ায় আমি খানিকটা বিস্মিত। বিষয়ে আঙ্গিকে এর চেয়ে শক্তিশালী ছবি উৎসবে দেখেছি। অবশ্য পাশ্চাত্যে আজকাল পরিবার ধারণাটি নিয়ে নতুনভাবে আবেগ কাজ করছে। পাশ্চাত্য বিচারকদের কাছে তার হয়তো ভিন্নরকম আবেদন রয়েছে।

মেক্সিকোর পরিচালক ক্রিস্টিন বার্কহার্ডের বাবা-মা ইউরোপে ছুটি কাটিয়ে দেশে ফিরছিলেন। বিমান দেশের মাটি স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তারপর বিমানে আগুন ধরে যায়। বিমানের সব যাত্রী বেরিয়ে আসতে পারলেও ক্রিস্টিনের বাবা-মা বেরিয়ে আসতে পারেননি। মৃত্যু হয় তাদের। খবরের ফুটেজ, পারিবারিক ভিডিও ও সহযাত্রীর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই ব্যক্তিগত ট্র্যাজিক ঘটনার স্মৃতিচারণার মাধ্যমে নিজের বেদনার সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন পরিচালক। তার মায়ের প্রিয় একটি ছড়ার পঙ্‌ক্তিই ছবিটির নাম, *ফ্লাই লিটল এঞ্জেল ফ্লাই*।

ইংল্যান্ডের ক্যারল মরলি সতেরো বছর আগে বিপুল উদ্দীপনায় ভারত ভ্রমণ করার সময় এক দুর্ঘটনায় পড়েন। তিনি এক শুকনো কুয়ায় পড়ে যান, তার মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। বহু বছর তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। পুরো জীবন বদলে যায় ক্যারলের। সতেরো বছর পর সুস্থ হয়ে মাদ্রাজের কাছে তার জীবন বদলে দেওয়া ওই কুয়াটির কাছে আবার ফিরে যান ক্যারল। তার ওই ফিরতি ভ্রমণ নিয়ে ডকুমেন্টারি *রিটার্ন ট্রিপ*। নিজের জীবনের একান্ত একটি ঘটনার ভিত্তিতে তৈরি ডকুমেন্টারি যে সার্থক হতে পারে এ পরিচালকরা তা প্রমাণ করেছেন।

ভারত

ভারতীয় জীবনের প্রসঙ্গ রয়েছে এমন দুটি ডকুমেন্টারি দেখেছি। ভারতীয় পরিচালক গৌতম রায় দিল্লির ফুটপাথে যৌনশক্তিবর্ধক ওষুধ বিক্রেতা এক ক্যানভাসারের জীবন নিয়ে তৈরি করেছেন ছবি *মজমা*। একদিকে ক্যানভাসারের দারিদ্র্য, অন্যদিকে অগণিত মানুষকে বক্তৃতায় সম্মোহিত করে রাখার ক্ষমতা ইত্যাদি মিলিয়ে চমৎকার সম্ভাবনাময় একটি বিষয়। কিন্তু পরিচালক সে সম্ভাবনা বিশেষ ব্যবহার করতে পারেননি। সম্পাদনার ত্রুটিতে এলোমেলো হয়ে গেছে ছবিটি। তেমনি জার্মানির পরিচালক টিল পাসওয়ের কলকাতার হাওড়া স্টেশন নিয়ে ডকুমেন্টারি *হাওড়া হাওড়া*ও সফল হয়নি। হাওড়া স্টেশনের মতো একটি স্থানকে নিয়ে ডকুমেন্টারি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারত কিন্তু হয়নি।

বিবিধ

আমার দেখা ডকুমেন্টারির তালিকায় আর যে ছবিগুলো রয়েছে সেগুলোকে বিশেষ কোনো শিরোনামে বাঁধা গেল না।

যেমন সমালোচকদের বিচারে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ডকুমেন্টারি অস্ট্রিয়ার পরিচালক নিকোলাস গেহালটারের *এলসহয়ার*। মিলেনিয়াম উদ্‌যাপনের উপায় হিসেবে পরিচালক ২০০০ সালে ১২ মাসে পৃথিবীর ১২টি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করে ১২টি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটের জীবনকে চিত্রায়িত করেছেন। নাইজারের মরুভূমির উটপালকদের কাছ থেকে গেছেন গ্রিনল্যান্ডের তুষার প্রান্তরের এস্কিমোদের কাছে। সেখান থেকে ফিনল্যান্ডের সিল-শিকারীদের কাছে। সেখান থেকে নামিবিয়ার রাখালদের জীবন, সাইবেরিয়ার তেলের খনির শ্রমিকের জীবন, পাপুয়া নিউগিনির অরণ্যবাসীদের জীবন, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের জীবন; ভারতের এক স্নাতক চিকিৎসক, চীনের এক রাখাল বৃদ্ধা, পলিনেশিয়ান দ্বীপের এক স্কুলশিক্ষিকার জীবন চিত্রায়িত করেছেন তিনি। বিংশ শতাব্দীর শেষ বছরটিতেও পৃথিবীর নানা প্রান্তে বসবাস করছে প্রায় সনাতন, প্রাকৃতিক জীবন-যাপনকারী এই মানুষেরা। চার ঘণ্টায় বিচিত্র এক বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা।

ব্রাজিলের পরিচালক জোয়া জার্ডিমের ডকুমেন্টারির বিষয় চোখ এবং দেখা। নাম *উইনডোজ অব দ্য সোল*। তিনি ব্রাজিলের বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক, সঙ্গীতকারের সঙ্গে চোখ এবং দেখা বিষয়ে তাদের ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন। এছাড়াও কথা বলেছেন নোবেলবিজয়ী পর্তুগিজ লেখক হোসে সারামাগো, জার্মান চলচ্চিত্রকার ভিম ভেন্ডার্সের সঙ্গে। সারামাগো বলছিলেন, রোমিওর যদি ঈগলের শক্তিসম্পন্ন চোখ থাকত তাহলে জুলিয়েটকে তার সুন্দর লাগত না। মানুষের দেখার একটা সীমাবদ্ধতা আছে এবং এই সীমাবদ্ধতাটিই মানবিক। ভিম ভেন্ডার্স বলছিলেন, আমাদের চোখের সামনে এখন এত অগণিত দৃশ্য, এত দ্রুত চলে আসছে যে, এখন আমরা আর কোনোকিছু অর্থপূর্ণভাবে দেখতে পারছি না।

নেদারল্যান্ডের পরিচালক লিও বোয়েবের ডকুমেন্টারি *আন্ডার মাস্কো* মস্কোর পাতালরেল স্টেশনগুলো নিয়ে। মস্কোর মেট্রো স্টেশনগুলো যেন এককেটি মিউজিয়াম। বর্ণাঢ্য কারুকাজে সেখানে চিত্রিত আছে রুশ বিপ্লবের গাথা। স্ট্যালিনের আমলে এই পাতাল রেলের উদ্বোধন ছিল এক বিশাল জাতীয় গৌরবের ঘটনা। কিন্তু সম্প্রতি মস্কোর মেট্রো স্টেশনগুলো জুয়াড়ি, সন্ত্রাসী আর মদ্যপের আখড়া। এই মেট্রো স্টেশনকেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় তুলে ধরেছেন পরিচালক।

বিংশ শতাব্দীকে ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস শতাব্দী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। শুধু যুদ্ধের কারণে ১০ কোটিরও অধিক মানুষ মারা গেছে এ শতাব্দীতে। যুদ্ধ থেমে গেছে কিন্তু বিপদ কাটেনি। ইউরোপের কোনো প্রত্যন্ত গমক্ষেতে এখনো পাওয়া যাচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এমনকি প্রথম মহাযুদ্ধেরও বিস্ফোরক। বসনিয়ায় এখনো নিয়মিত সরানো হচ্ছে স্থলমাইন, ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যবহৃত বিস্ফোরকের কারণে এখনো জন্ম নিচ্ছে দৃষ্টিশক্তিহীন শিশু। যুদ্ধপরবর্তী প্রভাব নিয়ে ডকুমেন্টারি নির্মাণ করেছেন কানাডার পরিচালক ডানিয়েল সেকুলিচ *আফটারমাথ* নামে।

ক্রোয়েশিয়ার পরিচালক ইগর মিরকোভিচ মজার এক ডকুমেন্টারি করেছেন *হু ওয়ান্টস টু বি প্রেসিডেন্ট?* নামে। ক্রোয়েশিয়ার জাতির পিতা বলে বিবেচিত তুজম্যানের মৃত্যুর পর ২০০০ সালে, তিন দশক পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। সে নির্বাচনে চারজন প্রধান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্যামেরা নিয়ে অনুসরণ করেন পরিচালক। তাদের ব্যক্তিজীবনের ঘনিষ্ঠ অনেক কর্মকাণ্ডসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ক্যামেরাবন্দি করেন তিনি। রাজনীতির আটপৌরে চেহারা মজার ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন তিনি।

আফ্রিকার একমাত্র যে ডকুমেন্টারিটি দেখার সুযোগ হলো সেটি জাম্বিয়ার পরিচালিকা সাম্পা বাঙ্গুয়ার *ইমিতি ইকুলা*। গত বছরের দুর্লভ সূর্যগ্রহণ পৃথিবী থেকে সবচেয়ে ভালো দেখা গিয়েছিল জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকায়। অগণিত মানুষের সঙ্গে লুসাকার রাস্তায় বেড়ে ওঠা বছর দশেকের এক কিশোরীও সূর্যগ্রহণ দেখার প্রস্তুতি নেয় বিপুল উৎসাহে। রাস্তায় নানারকম ছোটখাটো জিনিস ফেরি করে বেড়ানোই তার পেশা। সবসময় ছেলেদের পোশাক পরে থাকে সে। মেয়ে বলে বোঝার উপায় নেই। তবু সে তার নারীত্বকে নিরাপদ রাখতে পারে না। কিশোরী মনে করতে পারে না মোট কতবার সে ধর্ষিত হয়েছে। সম্প্রতি তার রক্তে পাওয়া গেছে এইডসের জীবাণু। সূর্যগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে এই মেয়েটির জীবনকে তুলে ধরেছেন পরিচালক। মেয়েটিরও তো একরকম গ্রহণলাগা জীবন। উৎসবের অনেক উল্লেখযোগ্য ডকুমেন্টারি দেখা হয়নি। দেখা হয়নি বিষয়ভিত্তিক আসরের ডকুমেন্টারিগুলো। তবে যে কয়টি দেখার সুযোগ হয়েছে, তাতে যেসব বিষয়, যেসব ভাবনা পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষকে তাড়িত করছে তার একটি পরিচয় পাওয়া গেল। বিচিত্র বিষয়ের সুনির্মিত এই ডকুমেন্টারিগুলো চিন্তাকে উসকে দেয়, এই সময়কে বুঝতে সহায়তা করে। প্রত্যাশা জাগে, আমাদের দেশে নানা আশ্চর্য মাত্রা নিয়ে যে জীবন বয়ে চলেছে তাকে ক্যামেরাবন্দি করবেন সৃজনশীল কোনো ডকুমেন্টারি নির্মাতা।

কাইফি আজমির কবিতা

সম্প্রতি মারা গেলেন কাইফি আজমি। পুরো নাম আখতার হুসেন কাইফি আজমি। ভারতের সমকালীন উর্দু ভাষার অন্যতম সেরা কবি ছিলেন তিনি। জন্ম ১৯১৮ সালে। আজীবন যুক্ত ছিলেন প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে। অভিনেত্রী শাবানা আজমিরও তিনি পিতা।

দ্বিতীয় নির্বাসন

নগরে ফিরে পড়ত সেই বন রামের মনে,
যদি সে পেত দেখতে তারই প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে
আসুরিক সে-উন্মাদনা ছয় ডিসেম্বরে
অবাক্ হ'য়ে ভাবত, এই দঙ্গল কী-ক'রে
আমার ঘরে ঢুকল!—পা-টা ধুতে সরযূ-নীরে,
দেখে গভীর রক্ত-আঁক, পা না-ধুয়েই ফিরে
আসত, আহা, সরযূ-তীর হ'তে,
রওয়ানা ফের হ'ত বনের পথে,
ফুকারি', এই রাজধানীটা নয় আমার তরে,
নির্বাসিত হলাম ফের ছয় ডিসেম্বরে।

নিগ্রহ

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়
ভেবেছিলাম, আটকাবে সে,
মনান্তরের অন্তে আবার উঠবে জেগে প্রণয়।
হাওয়া তখন উঠছে ফুলে আমাদের পিরানে,
ভেবেছিলাম, থেকে যেতে বলবে সে আমাকে,
পা নামাল যখন উঠে দাঁড়াতে সে,
ভেবেছিলাম, থামাবে—বা আমায় পিছু-ডাকে।
কিন্তু আমায় আটকাল না,
থেকে যেতেও কইল না আমায়,
একবারটি ডাকলও না,
'আবার এসো' বলল না সে হায়।
ধীর কদমে বেরিয়ে গেলাম আমি,
মাঝখানে ফাঁক চলল বেড়ে পেরিয়ে দিগন্ত
বিচ্ছেদের চূড়ান্ত পর্যন্ত

নৃত্যপর ফুলকি

দু'টি দৃষ্টিতে হঠাৎ যখন গেল ঠোকাঠুকি হ'য়ে
সেই ঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ-পারা ভালবাসা গেল উড়ে।

নরম, মাসুম, হাসিন, নেশালু একটা ইশারা হ'য়ে
বসল সে তার মুদিত নয়ন জুড়ে।

তারপর এক কোরক, কুসুম, রত্ন-তারকা হ'য়ে
পলকের তরে মিশল সে তার ললাটের রোদ্দুরে।

রঙ, রস, মধু—না না, তারও চেয়ে আরও মোহনীয় হ'য়ে
উড়ে গিয়ে তার পাপড়ির গালে বসল সে ঘুরে-ঘুরে।

সুর, সুরা, হাসি, বিজলির ধারা হ'য়ে
গাল থেকে খ'শে, ঠাঁই নিল তার রঙিন ঠোঁটের গুড়ে।

ভঙ্গিমা হ'য়ে, প্রলোভন হ'য়ে, উছল পারদ হ'য়ে
ঠোঁট ছেড়ে শেষে বরণ করে সে নিটোল গোল-বাহুরে।

কামনা, মহিমা, অপার করুণা, প্রেমের প্রতিমা হ'য়ে
বাহুর ভিতর দিয়ে সে যাত্রা করল হৃদয়পুরে।

অনুবাদ : সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

নূতন বোধিবৃক্ষ জাতক

জি য়া হা য় দা র

(বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক)

[কিন্তু] যে মূর্খ নিজেকে জ্ঞানী মনে করে, সে-ই প্রকৃত মূর্খ।
—*বুদ্ধদেব, ধম্মপদ : ৬৩*
মূর্খ ব্যক্তি পাপ কাজ করার সময় তার ফল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।
—*বুদ্ধদেব, ধম্মপদ : ১৩৪*

মহানির্বাণ লাভের পর মহামতি গৌতম বুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা জন্মাইলো, আরও একবার অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার জীবন-দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বোধি লাভ করিবার—কীভাবে সত্যবর্জিত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়।

তিনি দালাইলামার নিকট গমন করিলেন; কিন্তু ধমক খাইয়া বিরসবদনে চলিয়া আসিলেন : 'বাপু হে, আমি আছি বেইজিং-ঝামেলায়, তোমার বায়নাক্কা নিয়ে সময় দিতে পারবো না।'

মহামতি শাক্যসিংহ অনেকক্ষণ ধ্যানশেষে স্থির করিলেন, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের দেশে যাওয়া যাইতে পারে, কেননা তাহার নামের শেষে জ্ঞান শব্দটি রহিয়াছে।

তিনি আসিলেন। চট্টগ্রামের নন্দনকানন হইতে ঢাকার কমলাপুরের মহামহাথেরোদের সমীপে নতজানু হইয়া জানিতে চাহিলেন, সত্য-বিবর্জিত-জ্ঞানী হইবার সাধনার নিয়মপদ্ধতি। দালাইলামা তবু মুখ খুলিয়াছিলেন, মহাথেরোগণ ভীত-বিহ্বল দৃষ্টিতে নিরুত্তর। নৈরাজ্য-পীড়িত চিত্তে মহামতি সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন কিনা, এমত চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্ত। একাকী পথ চলিতেও তাঁহার শংকা ও ভীতি। ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতির নিষ্পাপ মুখমণ্ডল তাঁহার মানসচক্ষে উদিত হইয়াছিল।

আকস্মিকভাবেই সাক্ষাৎ হইলো ভিক্ষা সমাপনান্তে কুটিরাভিমুখী কঠিন চীবর পরিহিত বহুকালের সুহৃদ অনীশ বড়ুয়ার সহিত। মহামতি বুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিলেন শ্রমণ অনীশ। অতঃপর ইতিউতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অনুচ্চ স্বরগ্রামে বলিলেন : 'শুনেছি, ওইদিকে একটি তিন্দুকবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে, তাকেই বোধিবৃক্ষ বলা হচ্ছে। সেখানে জ্ঞানও আছে, পাপও আছে। সকলই শোনা কথা—প্রমাণে অক্ষম এ অধম—সেই বৃক্ষতলে কুশাসনে (কুশ+আসন, অনীশকে সন্ধিবিচ্ছেদ করে বলতে হলো) আসীন হয়ে মহাউল্লাসে কতিপয় সাধক সজ্ঞানে সত্য-বিসর্জিত-জ্ঞানের ঘোরে আচ্ছন্ন, এবং নিয়মিত ঐশীবাণী প্রদান করে চলেছে। হে অমিতাভ, তাদের সন্নিকটে গমন করুন, আমার ধারণা, তারাই আপনাকে যথাযথ শিক্ষা দেবার দক্ষতা অর্জন করেছে।'

'নূতন সে বোধিবৃক্ষ কোন দিকে'—জ্ঞাত হইবার ব্যাকুল আগ্রহ বোধিসত্ত্ব বুদ্ধের ক্ষীণ কণ্ঠে।

বিমূঢ় অনীশ। দীর্ঘ সময় তিনি নিমীলিত নেত্রদ্বয় নীল অম্বর পানে স্থাপন করিয়া শুধু উচ্চারণ করিলেন : 'ওই দিকে।'

তথাগত বুদ্ধের যেইটুকু বোধি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও অতি দ্রুত ভস্মীভূত হইয়া গেল।

গরম কালের দুপুরে সভ্যতা নিয়া ভাবনা

অ রূ প রা হী

ওজোন স্তরে ছিদ্র ছাড়া
সভ্যতার বড় কোনো চিহ্ন আকাশে কই?
মাটি, পানি আর বাতাস পাল্টাইয়া যাইতেছে।
পাল্টায়া যাবে গাছপালা, মানুষ—অন্যসব প্রাণী।
তবে ইতিহাসের গন্ধ থাকে। ফুলে-ফলে থাক বা না থাক।
স্বাভাবিক। খুব স্বাভাবিক। পাল্টায়া যাবে খাওয়া আর
ঘুমের কিসিম।
মাথার সামান্য ওপরে বিল্ডিং। আর কিছু নাই।
কী হম্বি-তম্বি করতেছ, কী ভাঙতেছ, কী গড়তেছ—
ঘুইরা-ফিরা মাটিতেই। নিজের শইলে।
মাটির ওপরতলে সামান্য কোলাহল, জটলা এবং
গোছ-গাছ করার চেষ্টা চলতেছে।
ফাঁকে ফাঁকে ডানপিটা, দিগ্বিদিক কিছু লোক আকাশের
গ্রাম-শহরে এ বাড়ি-ওবাড়ি উঁকি-ঝুঁকি মারতেছে—
হাঁইট্যা বেড়াইতেছে। ওই দ্যাহ, তোমার ঘরে
কেরা জানি ঢুইক্যা পড়তেছে!

ইশ্‌কাপনের বেগম

খো ন্দ কা র আ শ রা ফ হো সে ন

তাসের খেলায় আমাকে হারাতে চায় আর তিনজন
তাদের চতুর ট্রিক ধরি আমি হেন সাধ্য নাই
বারবার হারি আর বগল বাজাই
কারা যেন যতবার শাফলে বিস্রস্ত করে তাসের ক্রমিক
ঠিকঠিক উড়ে যায় বেহাতে (ব্যাপার কি!) টেক্কা ও সায়েব
পড়ে থাকে দুরি-তিরি আর থাকে অনিবার্য দশ—
বিবি ও গোলাম দেখি তারাও গায়েব!
অথচ (তাহারা বলে) দশে নাকি দশদিক, হয় দশভূজা—
তারও পূজা করিয়াছি কায়মনে, অবশেষে বুঝিনু নিষ্ফল!
রাজা রানী নফরের শুধু হাতযশ!

খেলেছি ব্রিজের খেলা কন্ট্রাক্ট অথবা অক্‌শান
বাহান্ন তাসের যাদু একদা শিখিয়েছিল পিতা
অথচ সে লোকসান পুরাটাই, শেষে তিন তাস—
ফ্লাশ ছেড়ে মন দিই একেলায়
গরীবের ব্রে-খেলায়
নিয়তি ঘাড়ের 'পর ফেলে শুধু গরম নিঃশ্বাস
আর বলে, 'বল তুই কোন্ তাস নিবি?'
আমি মূর্খ বলি, 'ঠিকঠিক চলে যায় বেহাতে (ব্যাপার কি!) টেক্কা ও সায়েব
—চাই ইশ্‌কাপনের বিবি।'
তাসের খেলায় আমাকে হারিয়ে দেয় আর তিন জন
কখনো প্রবল কেউ টেক্কা দেয় একা,
কখনো গোলাম এসে নবাবীর লাটিম ঘোরায়
আর আমি নিকষ্য গর্দভ মাতি ব্রে-খেলায়—
আমার কপালে লেখা ভুষি-দানাপানি
—ইশকাপনের রানী!
যতবার তাস তুলি ততবার তিনি
যেদিকে ফিরাই চোখ, তার মুগ্ধ কটাক্ষের জ্বালা
আমাকে জিগ্যেস করে নীল মেঘমালা—
'কৌন লওগে তুম্, খুশি ঔর গম্?'
আমি শুধু বিমুগ্ধ উচ্ছাসে বলি
—ইশ্‌কাপনের বেগম॥

ইলিশ-কাটা গোল খাড়ু

মা হ মু দ না সি র জা হা ঙ্গী রি

বেদনার নীল নারী জলটুঙ্গিতে পাখনা মেলে দেয়া
পানকৌড়ির মতন। কটাক্ষে চেয়ে অবাক সে শবরী :
কচুরিফুলের মত চোখ যার। চুলে তিলপাতা, কেয়া—
কানে রিঠাফুল, তালপাতার গয়না; পরনে নীলাম্বরী।

রাতের নদীতে ভাসে জোছনার গন্ধমাখা আকুল ছাতিম
ফোটে কেশের লাছিতে তার; বাজুতে শাপলা ডাঁটার বালা।
চুলে বেলের তিনটি পাতা স্থিতি সৃষ্টি আর বিনাশপ্রতিম
খোঁপা ঘন অরণ্যের রাত। গলায় হিঙ্গুল গুঞ্জার মালা।

কাঁকড়ার মত কোনো এক বেদনার তীব্র মরণ-কামড়ে
চুলের বিনুনি থেকে পর্ণশবরী নিষ্ফল করেন দোহন
গহীন কালো রক্তের অনুশোচনার ধারাকে অঝোরে
আকাঙ্ক্ষার সোনা জ্বলে উঠে—এ' হৃদয় করে গেলে শোধন।

জয়কলশের মুখে একটানা কেঁপে মরে ব্রঞ্জের পানদান
পরাতে ইলিশ-কাটা গোল খাড়ু—আপনার পায়ের সম্মান॥

মাদুলিচেতনা, ২০/১১/৯০

মা তি য়া র রা ফা য়ে ল

অতঃকিম্ সোভিয়েত?
ততঃকিম্ কৃষ্ণসাগরতীরে কৃষ্ণনক্ষত্রের বিভেদ।

অন্তিম হিতাকাঙ্ক্ষী, যারা সন্নত মস্তকে বর্তমান; আর
মর্ত্যমান অন্যেরা, যারা, পেছনে পড়ে আছে—
তাদের চোখে কেবলই ভাসে সম্ভাব্য প্রান্তিক পরিণতি—
[কোণে অসম্ভাব্যতা]
দ্বান্দ্বিক দোলায় কেবিনে পড়ে থাকে, নিভাষ *পড়বাস* মৃত্যুপ্রাঙ্‌লাশ;
এবং টেবিলে-ফ্লোরে-আলোড়ে, ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত হিম অচল
দেহবন্দি অস্তিত্ব ছাড়ে নীরব ক্ষয়িষ্ণু নিঃশ্বাস—
উপরন্তু, সারি সারি চিরটাটকা ধবল আত্মা, দাঁড়িয়ে ঠায় চুনিজল হাতে
তোলে অম্লঢেঁকুর, মৃদু মৃদু কম্পাতুর, দূর অবিনাশী,
বায়ু-জরায়ু-আয়ুর...

এবং রাত যতই গুমট প্রগাঢ় হতে থাকে, দিবস ততই তরল
কুয়াশাভার হয়ে আসে;
অকস্মাৎ প্রণয়ী সকল ঈপ্সার বিন্দুবারুদ হারিয়ে যায় নিমেষে
বৃষের হাম্বার বিন্যাসে...

তখন আকাশ ফুঁড়ে নেমে আসে আশু, স্মিত প্রসন্ন হৃদয়ে এক
দেবশিশু—
দেখায় স্বপ্ন, আসন্ন মর্মর স্বপ্নের—অগুনতি নক্ষত্রখচিত
বর্ণিলা জড়োয়া...

ওদিকে, তাৎক্ষণাৎ সেই কেবিনমানবশিশু, মাটির গন্ধেই ফিরে পায়
পুনর্বার তার
গোকুলে হারিয়ে ফেলা মাদুলীচেতনা, চকিতে মাছের পাখনায়—
আকণ্ঠ জলভর্তি
মেটে কলসির ভেতর।

দৃশ্যত গজিয়ে উঠছে দৃশ্য নিঃশব্দে, ধূলিজরায়ূ একটি দেবদারু
আর একটি তুষার-তৃষ্ণ চন্দ্রমল্লিকা—
ওড়ে ওড়ে ভূলোক-কাঁপা আলোক, পুলক সঞ্চার, মিহি প্রপঞ্চ,
অতীন্দ্রিয়বোধ
কাশবনের পেলব ছোঁয়া...

বাতিক

সেলিমা রাহমান

রাফিয়া ইসলামের অবস্থা ভালো। ছেলেমেয়ে মাত্র দুটি। তারাও বিয়েশাদি করে আলগা হয়ে গেছে। দুজনেই চাকরি করে।

রাফিয়ার নিজের ফ্ল্যাট আছে। একজন কাজের বুয়া নিয়ে একাই গোছগাছ করে থাকেন। স্বামী নেই বটে তবুও তিনি ভালো কাপড় পরেন। হাল্কা মেকআপ করেন। লিপস্টিক ব্যবহার করেন।

তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় আছে। সকলের সঙ্গে মেলামেশা বজায় রেখেছেন। থিয়েটার দেখেন, সভা-সমিতিতেও যান, ছবির একজিবিশন দেখেন।

তার একটিই মাত্র বাতিক, পরোপকার করা। আত্মীয়স্বজনদের উপকার করার দরকার হয় না। তার পরোপকার করার ইচ্ছা হয় গরিব অসহায় মেয়ে মানুষদের। এই প্রবল উপকার করার ইচ্ছা তাকে অনেক সময় বিপদে ফেলে।

একবার এক বস্তির মেয়ের অভাবের কথা শুনে তাকে বেশ কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তারপর থেকে সে প্রতি মাসে বারদুই—তিন আসে আর টাকা চায়। প্রথম প্রথম দিয়েছিলেন। এখন বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। অজস্র টাকায় ভরা ধনভাণ্ডার তো তার নেই। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। দিতে হয়। আর একবার এক স্বামী-খেদানো স্ত্রীলোককে জনতিনেক বাচ্চাকাচ্চাসহ গ্যারাজে আশ্রয় দিয়েছিলেন দু-চার দিনের জন্য। আজ দুই বছরের বেশি হয়ে গেল সে গ্যারাজ ছাড়েনি। তার পুরনো গাড়িটা দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয় কোনোমতে। মাঝে মাঝে বাইরে পড়ে থাকে ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও। কারণ সারা মেঝেজুড়ে বাচ্চারা শুয়ে থাকে। এক কোনে তাদের রান্না হয়। স্ত্রীলোকটি বাইরে যাওয়ার সময় তালা দিয়ে যায়। বাচ্চারা লনে ক্রিকেট খেলে ফুলগাছগুলো শেষ করে দিল। যেখানে সেখানে হেগেমুতে একাকার করে রাখে। কিছু বললে মেয়েটা খ্যান খ্যান করে, আল্লা গরিবদের উপর জুলুম, চোখে দেখ না?

রাফিয়া ইদানীং তাকে ভয় করেন।

তার বোনঝি ইউনিভার্সিটি পড়া মেয়ে মন্দাকিনী বলে, 'খালামণি, এ যুগে কারো উপকার করতে নেই। তুমি বুঝতে চাও না বলেই এই দুর্গতি।'

সেদিন রাফিয়া রিকশায় করে বাজারে যাচ্ছিলেন। ড্রাইভার জবাব দিয়ে গেছে। বলেছে, গ্যারাজের মাতারিসহ ছোড়াগুলোকে না তাড়ালে সে কাজ করবে না। তার দোষ নেই। বল খেলে, কাদা মাখিয়ে গাড়ির যা অবস্থা করছে। তার ওপর তাদের মা নালিশ করেছে, ড্রাইভারের মতলব খারাপ। তার কাছে কুপ্রস্তাব করেছে। প্রচণ্ড রোদবৃষ্টিতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ড্রাইভারকে। বসার জায়গা নেই।

ড্রাইভার নাকি কান মলে কসম তওবাতিল্লা করেছে। বলেছে, তার ঘরে জওয়ান বউ আছে। কোন দুঃখে সে বুড়ি চার ছেলের মা পেত্নীর সঙ্গে ভালোবাসা করতে যাবে? তার কি ঘেন্নাপিত্তি নাই?

রাফিয়া রিকশা চড়ে যাচ্ছিলেন। পথের ধারে একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ইট, কাঠ, লোহার রঙ, বালি, ঢালাই মেশিন দিয়ে সারা পথ একাকার। একদল মেয়ে মজদুর কাজ করছে। পুরুষও আছে। তিনি দেখলেন, একটি মেয়ে মজুরকে একটা রোগা প্যাংলা পুরুষ লোক বেধড়ক পেটাচ্ছে। ভিড় করে অন্য সকলে দেখছে কিন্তু কেউ অসহায় মেয়েটিকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে না। দুটি অবোধ শিশু মায়ের কাপড় ধরে ঝুলছে আর লোকটার মার খাচ্ছে। রাফিয়া ইসলাম রিকশা থেকে নামলেন।প্রহাররত সেই লোকটাকে ধমক দিয়ে বললেন, এই অমন করে মারছো কেন? খবরদার, থামো, থামো বলছি।

লোকটা চোখ গরম করে বলল, আমার বউরে মারতেছি তাতে আপনের কী? আপনে কওনের কেডা?

রাফিয়া জনতার দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে মজা দেখছো, তোমরা আটকাতে পারো না?

জনতা নীরবে সরে যেতে লাগল—ওর মধ্যে একজন বলল, নিজের স্ত্রীকে মারার হক আছে ওর। আমরা বললে ও শুনবে না। মিছামিছি অপমান হন ক্যান? যান গা।

একটা মেয়ে বলল, হাচা কথা। ওর বউরে তো অন্য কেউ মারে নাই। ওর স্বামী মারছে। আপনের কী?

রাফিয়া চড়া গলায় বললেন, এই যে কি নাম তোমার? বৌকে খুন করবে আর লোকে দাঁড়িয়ে দেখবে? আমি এক্ষুণি পুলিশ ডাকব। তোমাকে দিয়ে জেলের ঘানি ঘোরাব। শয়তান লোক কোথাকার।

লোকটার তখন হাত থেমেছে বটে কিন্তু মাটি থেকে একটা তক্তা কুড়িয়ে নিয়েছে। সে বলল, আপনে অর স্বভাব চরিত্তির জানেন? ব্যাডাগো লগে ফষ্টিনষ্টি করে। কামাই করা টাকা আমারে দিতে চায় না। হারামজাদির টাকা নিয়া কি আমি লাটসাহেব হমু? অয় আমারে ঘরে ঢুকতে দেয় না। বলে আর পোলাপান নিব না।

বউটা তখন গায়ের ধুলো ঝাড়ছে। বাচ্চা দুটি মাকে লেপটে ধরে ফোঁপাচ্ছে। বউ বলল, দিনে ষাট টাকা মজুরি পাই। ঝোপড়ার ভাড়া দিয়া পোলা দুটারে খাওয়াইয়া হাতে কী থাকে যে অর জুয়া খেলার পয়সা দিমু। ইট ভাইঙ্গা হাতে ফোস্কা পড়ছে। লোকে কামে লইতে চায় না।

স্বামীটা তক্তা দিয়ে তার পিঠে একটা বাড়ি মারল। আবার কথা কস? আইজ তরে শ্যাষ কইরা ফালামু।

রাফিয়া বললেন, তুমি থামবে না? বউটাকে খুন করে ফেলবে? আমি থানায় যাচ্ছি, পুলিশে দিচ্ছি তোমাকে, পাজি শয়তান কোথাকার।

লোকটা গরম গলায় বলল, যান। আপনের বাপেরে ডাইকা আনেন। আমার বউ আমি মার্ডার কইরা গাঙ্গে ভাসাইয়া দিমু। আমি ফাঁসিতে ঝুললে, কার কী?

রাফিয়ার জেদ চড়ে গেছে। সত্যিই তিনি নিকটবর্তী থানায় গেলেন।

স্বয়ং দারোগা সাহেব চেয়ারে বসে সিগারেট টানছেন এবং কাচের একটা পেপার ওয়েট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেলা করছিলেন।

আবদালী হাঁ হাঁ করে উঠল।

দারোগাটা খুব ভদ্র।

রাফিয়াকে দেখে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বসতে বললেন। বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, ম্যাডাম, আপনার কী খিদমত করতে পারি?

রাফিয়া বললেন, আমার সঙ্গে একটু আসুন। এই কয়েক গজ দূরে একটা লোক তার বউকে বেধড়ক পেটাচ্ছে। মেয়েটা খুন হয়ে যাবে।

দারোগা বলল, এ দেশে বউকে ওই শ্রেণীর লোকরা সবাই পেটায়। এখন ভদ্র ঘরেও হচ্ছে। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে ডিউটি ফেলে যাওয়া যাবে না। আপনি ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

রাফিয়া তবু বললেন, প্লিজ একটু চলুন আমার সঙ্গে। হয়তো এতক্ষণে খুন হয়ে গেছে। মাত্র পাঁচ মিনিটের কাজ। প্লিজ—

দারোগাটি বললেন, আচ্ছা চলুন, আপনি যখন এত করে বলছেন। তবে জেনে রাখেন, এটা আমার ডিউটি না।

রাফিয়া ও দারোগা অকুস্থলে এসে দেখেন সব নির্জন শান্ত। কাজ শুরু হয়েছে। মার খাওয়া স্ত্রীলোকটি উদোম বুকে বসে তার কোলের ছোট ছেলেটাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। তার মারকুণ্ডা স্বামী সামনে বসে একটা মাটির শানকি থেকে একগাদা ভাত মরিচ-নুন দিয়ে টাউ টাউ করে গিলছে। নিশ্চয়ই বৌটার দুপুরের খাবার। টিফিনের সময় খাবে বলে রেঁধে এনেছে।

রাফিয়া এ দৃশ্য আশা করেননি। তবু তাদের দেখিয়ে বললেন, এরাই। কী বলব আপনাকে। প্রচণ্ড পদাঘাত ছাড়াও বাঁশ, কাঠ যা পাচ্ছিল তাই দিয়ে পেটাচ্ছিল। চোরের মার—

দারোগা ঠিক দারোগাজনোচিত সুরে ধমক দিলেন, এই ব্যাটা সত্যি বল, এই মহিলার কথা ঠিক? তোকে গারদে পুরব কোমরে দড়ি বেঁধে।

জবাবে লোকটা ঘোঁত করে একটা শব্দ করল।

পুলিশ দেখে কামলারা কাছে ঘেঁষছে না। দারোগা তাদের দিকে হেঁকে বললেন, কীরে মারছিল নাকি? সত্যি বল, সবকটাকে চালান করে দেব হাজতে।

আধবয়সী একজন ওস্তাগর বলল, আমরা কিছু দেখি নাই। কাম ফেলে তামশা দেখার সময় কই আমগো?

দারোগা হেসে বললেন, দেখি। আপনার ভিকটিম কী বলে? এই যে মহিলা, লোকটা তোমার কে হয়?

মেয়েটি বলল, আমার হাজব্যান্ড।

দারোগা বললেন, বাহ! দিব্যি স্মার্ট মহিলা তুমি দেখছি। হাজব্যান্ড যদি মেরে থাকে, নালিশ করো। সাজা হবে। মেয়েটা নির্লিপ্তভাবে বলল, না, মারেনাই। মিছামিছি নালিশ দিব ক্যান।

দারোগা বললেন, চলুন ম্যাডাম। আপনার আমি প্রশংসা করি। জেনে রাখুন, এদের উপকার করা বড় কঠিন কাজ। আমরা পুলিশের লোক, হার মেনে গেছি। আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি আপনি শিক্ষিত মমতাময়ী মহিলা। আপনার সময়টা সভা-সমিতি, সংস্কৃতি চর্চা এসব কাজে ব্যয় করবেন। ম্যাডামকে কি আমার জিপে পৌছে দেব?

রাফিয়া বললেন, ধন্যবাদ। তার দরকার নেই।

দারোগা মুচকি হাসলেন।

ফেরার পথে রাফিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, জীবনে আর কারো উপকার করতে যাবেন না। চোখ-কান বন্ধ করে পথ চলবেন।

বাড়ির লনে পা দিয়েই নবজাত শিশুর কান্না শুনতে পেলেন। গ্যারাজের ভেতর থেকে শব্দ আসছে। উঁকি মেরে দেখেন অন্ধকার কোনে সদ্যপ্রসূত এক শিশুর নাড়ি কাটছে ব্লেড দিয়ে নোংরা কাপড় পরা এক চামারনী দাই।

তাকে দেখে আশ্রয় দেওয়া মেয়েটি যার নাম তাহেরা বেরিয়ে এল আকর্ণ বিস্তৃত হাসিমুখে। বলল, আমার ভাতিজি। ভরা পোয়াতি বউরে ফালাইয়া জামাই ভাগছে। তিন কুলে কেউ নেই, আমি ছাড়া। ফালাইয়া দেই কী কইরা, তাই নিয়া আইলাম। পোলা হইছে। বড় লোকের পোলাগো লাকান সোন্দর। আপনের মতো ধলা রঙ।

রাফিয়া বললেন, ওরা এখানে থাকবে নাকি?

তাহেরা বলল, তয় যাইব কই? থাকব এক কোনায় পইড়া। আম্মা আমারে একশ টাকা দিতে হইব, দাইয়ের মজুরি। আমার হাতে কিছু নাই। আম্মা, ভাতিজির এই চৌদ্দ বছর বয়স। বড় দুর্বল হইয়া পড়ছে। একটু দুধ দিবেন অর লাইগা।

রাফিয়া নীরবে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। অজ্ঞাতসারেই তার হাত দুটি আলমারির তালা খুলল। মাত্র একশ টাকাতে কি হবে? এখন ওষুধ আছে। পথ্য আছে। বুয়াকে ডেকে বললেন, আমি একটু দোকান থেকে আসছি। ফ্রিজে পাউরুটি আছে। আড়ংয়ের এক প্যাকেট দুধ আর দুটি ডিম তাহেরাকে দিয়ে এসো।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশায় বসে ভাবলেন, ওদের কিছু পুরনো কাপড় দিতে হবে। আপাতত এক শিশি ডেটল, কিছু তুলো আর বাচ্চাটার জন্য কিছু জামা কাপড় কিনবেন। ওই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাচ্চার কিছু হলে তিনি নিজেকে মাফ করতে পারবেন না।

যাক নতুন একটা কাজ পাওয়া গেল।

কামলা মেয়েটির জন্য অপমানিত হওয়ার কথাটা তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন।

প্রদর্শনী

হরফের রূপ

রনি আহম্মেদ

মুক্তিযুদ্ধকে ভালোবেসে এ দেশে বেশি উদ্বেলিত হয়েছেন দু শিল্পী—চিত্রশিল্পী সাহাবুদ্দীন ও ভাস্কর রাসা। এই ভালোবাসা তাদের শিল্পকর্মে উষ্ণতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির যোগান দিয়েছে। সাহাবুদ্দীনের মতো শিল্পী রাসাকে চিহ্নিত করতে গেলেও মুক্তিযুদ্ধ প্রধান নিয়ামক হতে পারে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী গ্যালারিতে এপ্রিলের ১৩ থেকে ২০ পর্যন্ত রাসার ভাস্কর্য প্রদর্শনী হলো। ভাস্কর্যের বিষয় ছিল বাংলা অক্ষর। বাংলা অক্ষর শিল্পীর কাছে ফর্ম হয়ে ধরা দিয়েছে এবং এই ফর্মে ঐতিহাসিক গুণ যুক্ত করতে তিনি বেছে নিয়েছেন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে ভাষা আন্দোলনের চেতনার দিকে তার এই অবস্থান গ্রহণের কারণে আগের রাসাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় চেতনার স্থান বদলের ফলে তিনি নিজেও নিজের কাজের সামনে কিছুটা আগন্তুক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যত না শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-কেন্দ্রিক তার চাইতে ভাষা আন্দোলনের চেতনা অনেক বেশি এই শ্রেণীকে কেন্দ্র করেই জমে উঠেছে। তাই এই ইতিহাসের ইতিহাস শিল্পক্ষেত্রে দাবি করে কিছুটা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্ষেপণ (যেহেতু শিক্ষিত শিল্পীদের মূল উপলক্ষ মধ্যবিত্ত সমাজই)।

রাসা কাঠের কাজেই সবচেয়ে সফল। অন্য মাধ্যমের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। কাঠের সঙ্গে তার সম্পর্ক মনস্তাত্ত্বিক। কাঠ দিয়ে তিনি তার শিল্প তৈরি করেন না। বলা ভালো, কাঠ থেকে তিনি শিল্পবস্তুটিকে কেটে চেঁছে বের করে নিয়ে আসেন। তাই তিনি কাঠের অখণ্ডতাকে চূড়ান্ত মূল্য দিয়ে থাকেন।

বর্ণমালাপ্রসূত এসব ভাস্কর্যে দেখা যায় বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সমাহার। বেশির ভাগ ভাস্কর্যে দুটি অক্ষরের দ্বৈত অবস্থান অঙ্গাঙ্গি দেখা যায়। এই অঙ্গাঙ্গি অবস্থানের ফলে বিভিন্ন ধরনের স্পেস তিনি সেখানে তৈরি করতে পেরেছেন। এসব স্পেসে আলো-ছায়ার খেলাটাও অনেকটা অনির্দিষ্টতার ইমেজ দেয়। কখনো দুই বা ততোধিক বর্ণের মিলনে সংকেতের মতো কিছু সৃষ্টি হওয়ার ঝোঁক থাকে। বর্ণমালাগুলোর গঠনে যখন সরল অভিব্যক্তি তৈরি হয় তখন কিছুটা সাধারণ মনে হয় তাদের।

সম্পূর্ণ মানববিহীন, ননফিগারেটিভ এসব কাজ রাসার মতো চরম অভিব্যক্তিবাদী ফিগারেটিভ শিল্পীর জন্য নতুন জগৎ নিঃসন্দেহে। বর্ণমালা নিয়ে এ ধরনের কাজ এ দেশে প্রথম। অবশ্য আমাদের ভাস্কর্য-শিল্পীরাও নতুন ফর্মে যেতে তেমন আগ্রহী নন। নতুন বলতে মনে করা হয় ইনস্টলেশন জাতীয় কাজকে। অগভীর, অস্বচ্ছ জায়গায় দাঁড়িয়ে এই সিদ্ধান্ত টানা হয়।

রাসার এই বর্ণযাত্রা নতুন হলেও তার শিল্পীসত্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য (আবেগ, ক্রোধ, বিদ্রোহ, বিশালত্ব, গল্প বলা ইত্যাদি)গুলো পূর্ণ মাত্রায় এগুলোতে সমন্বিত হয়নি। ভবিষ্যতে হয়তো হবে।

সৌন্দর্যের কয়েক ধাপ

মোস্তফা জামান

আহমেদ নাজিরের ছাপচিত্র চোখকে আরাম দেয়। রঙ, তলের বৈচিত্র্যময় বুনট, মেঘময় ফর্ম এসবের সঙ্গে ছন্দোময় রেখার ব্যবহার, এসবই সৌন্দর্য প্রকাশের ইচ্ছাপ্রসূত। এই শিল্পীর তরিকায় সৌন্দর্যই মৌল বিষয়। যদিও প্রথম দিকের কিছু কাজে সৌন্দর্যের পাশাপাশি গল্প বা বিষয় নির্ভরতা আবিষ্কার করা যায়। চিত্রক গ্যালারিতে ৩ মে থেকে শুরু হওয়া ১০ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী একটি রেট্রসপ্যাকটিভ ছিল। এতে শিল্পীর চিত্র-শিক্ষাকালীন দু-একটি ছবি থেকে শুরু করে একেবারে সাম্প্রতিক উৎক্ষেপও উপস্থাপন করা হয়েছে। শিল্পীর কাজের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই এমন দর্শকের কাছে এই প্রদর্শনী কয়েকজন শিল্পীর যৌথ প্রদর্শনী বলে মনে হতে পারে। শিল্পীর ১০ বছরের শিল্পকর্মের নানান উৎক্ষেপ এখানে একত্রে উপস্থাপিত। সূচনা লগ্ন থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত ৪/৫/৬টি ধাপ আবিষ্কার করা সম্ভব। এই চারটি ধাপের যেমন যোগসূত্র স্থাপন করা যায়, তেমন ধরে নেওয়া চলে যে এই চার ধাপ চারটি পৃথক শাখা। শাখাগুলো মোটামুটি একই কাণ্ড থেকে ছড়িয়েছে বলা চলে।

শিল্পীর প্রাথমিক ধাপের কাজে বয়জ্যেষ্ঠ শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদের সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত রেখানির্ভর মানব অবয়বের মোটিফ লক্ষণীয়। ক্ষেত্রের বিভাজন ও যেকোনো একটি প্রধান রঙের সূক্ষ্ম পার্থক্য সৃষ্টি করার চেষ্টাও ওই একই শিল্পীর অতিচর্চিত শিল্পগুণ অনুসরণ করে সৃষ্ট।

আহমেদ নাজিরের নিজস্বতার দিকে প্রাথমিক পদক্ষেপ মূলত লাইন ও ফর্মের কড়া শাসন ভাঙার মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয়।

এই শিল্পী সিরিজ সৃষ্টিতে মনোযোগী, যে কটি দৃষ্টিনন্দন, শিল্পোত্তীর্ণ কাজ এই প্রদর্শনীতে আছে তার সবগুলোই এই সিরিজ সৃষ্টির প্রয়াস থেকে পাওয়া বলে মনে হয়। শিল্পীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিরিজের বা ধাপের কাজের মধ্যে সম্পর্কটা অন্যান্য ধাপের চেয়ে গাঢ়। তথাপি নব্বই দশকের শেষদিকের কাজের সঙ্গে নতুন শতকের সাম্প্রতিক কাজের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্যও চিহ্নিত করা যায়। মূলত এই পার্থক্য মাধ্যমের। শিল্পীর নব্বই দশকের কাজে বোর্ডোগ্রাফি নামক একটি নিজস্ব নামের ও পদ্ধতির ব্যবহার এই সময়ের চিত্রগুলোতে টেক্সচার বা গ্রন্থন প্রক্রিয়া-নির্ভর করে তুলেছে। এই সময়ের রোমান্টিকতা অতি লঘু, ছবিতে বহুমাত্রিক রঙ ও ফর্মের স্তর সৃষ্টি করার চেষ্টা দেখা যায়। এই মাধ্যমে করা ছাপচিত্রে চিত্রের প্রত্যক্ষতার বদলে বিন্যাসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। যার ফলাফল অতিমাত্রায় দৃষ্টিনন্দন চিত্রকল্প। সাম্প্রতিক কাজগুলোতে প্রত্যক্ষতা একটি লক্ষণীয় গুণ। পরিশীলনের বদলে এচিং ও ড্রাইপয়েন্ট এই মাধ্যমগুলোর সহজ স্বাভাবিক সম্ভাবনা ব্যবহার করে প্রত্যক্ষতা অর্জনের চেষ্টা দেখা যায়। তাই এই সাম্প্রতিক কাজগুলো অল্প দৃশ্য উপাদান ও সাধারণ কারিগরি কসরতের ব্যবহারের মাধ্যমেই প্রকাশময় বলা চলে অধিকমাত্রায় প্রকাশময়। 'দি ওয়ার ফাইল' শিরোনামের যে কটি বড় মাপের ড্রাইপয়েন্ট রয়েছে, এই চিত্রগুলোই তার সার্থক সৃষ্টি, যদি শিল্পীকে মাধ্যম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরিশীলনের বদলে এই চিত্রগুলোতে ইনফর্মাল বা মাধ্যমের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারে গড়ে ওঠা চিত্রকল্পের ব্যবহার আবিষ্কার করা যায়। এই চিত্রগুলো প্রায় সাদাকালো অর্থাৎ এই পর্যায়ে এসে শিল্পী কোমল মিষ্টি রঙ থেকে বেশ দূরে সরে এসেছেন। এই একই চরিত্রের, একই আয়তনের 'প্লানেট লাভ' নামের এচিং বা ধাতুতক্ষণের কাজগুলোতেও শিল্পীর পূর্ববর্তী সৌন্দর্য চেতনা ভিন্ন মোড় নিয়েছে। যদিও এচিংয়ের রেখায় গড়ে ওঠা চৌকন ফ্রেম এবং তার ভেতরে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) সে সময় পরিবেশ সৃষ্টিকারী টেক্সচার এসবই তার মাধ্যমের মাত্রা অতিক্রম করার বিফল চেষ্টাপ্রসূত। বিফল এজন্য যে, এগুলোতে চমক সৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা রয়ে গেছে। যে প্রবণতা তার পূর্বের অর্থাৎ নব্বইয়ের শেষ ভাগের কাজে অতিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। 'প্লানেট লাভ' নামের পাশাপাশি উপস্থাপিত দুটি চিত্রে এই প্রবণতা কম, 'রিফ্লেকশন অফ দি মুন' নামের এচিংটিতে এই প্রবণতা গাঢ়তর। তিনটি গোলাকার অংশ জিঙ্ক প্লেট থেকে কেটে ফেলে দেওয়ার মধ্যে যে অভিনবত্ব তার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ঘন টেক্সচার ও কালোর বিপরীতে সাদা বড় বড় বিন্দুর আধিক্য চিত্রকল্পকে ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। যে দিকটি মাধ্যমকেন্দ্রিক চমক সৃষ্টির দিক।

শিল্পী আহমেদ নাজিরের কাজ মূলত মাধ্যমের অর্থাৎ ছাপচিত্র মাধ্যমের প্রক্রিয়াগত দিক-নির্ভর শিল্প। 'ভাইব্রেশন', 'মুন প্লানেট' বা 'প্লানেট লাভ' এই নামগুলো যেমন দূরবর্তী এবং ভাবালুতাময়, তার চিত্রকল্প তেমন আবেগময়তা নির্ভর না তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কাজ দূরবর্তী শিল্পীর হাতের সৃষ্টি বলে মনে হয়। শিল্পীর গত শতকের কাজে মাধ্যমের সঙ্গে চিত্রকল্পের দূরত্ব অনেক অর্থাৎ যে মাধ্যম ব্যবহার করেছেন তার চরিত্র সেখানে নেই, আছে অতিমাত্রায় ব্যবহৃত ফরমাল এলিমেন্ট বা চিত্রগুণ কিংবা উপাদান। তার যেসব কাজে জাগতিক ভাবালুতাহীন চেতনা বা বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে, তা বিচার করে দেখলে বিষয় ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যকার দূরত্ব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। 'ওয়ার ফাইল' নামের ছোট এক সারি ভিজি প্রিন্ট ও ছাপচিত্রের মিশ্রণে করা চিত্রগুলোতে এই দূরত্বের উপস্থিতি প্রকট। কারণ এগুলোও মাধ্যমের প্রক্রিয়া প্রসূত শিল্প যা ভাব প্রকাশ করে নিশ্চিত কিন্তু এই ভাব শিরোনামের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন।

সাম্প্রতিক ছবিগুলো দেখে বোঝা যায় যে, শিল্পী তার শুরুর দিকের বিষয়-নির্ভর ভাবনায় ফিরে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু তার বাহন নতুন। তার বাহন সম্পর্কে একটি দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হয় দর্শকের মনে। কারণ তার অধিকাংশ ছবিতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবার উপাদানই বেশি। এই উপাদানগুলো স্বনির্দেশক, অর্থাৎ ছবির এই অন্তস্থিত গুণাগুণ ছবির বাইরের কোনো বিষয়ের দিকে নির্দেশ করে না। এ কারণেই অধিকাংশ শিল্পকর্মের সঙ্গে মনের বা মানসিক তাড়নার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। চিত্রের নাম নিয়ে তাই এই ছাপচিত্রীর ভাবনার প্রয়োজন আছে। চিন্তা ও চিত্রের যোগসূত্রটি তাহলে নামেই উদ্ঘাটিত হতে পারত। এই শিল্পীর অধিকাংশ চিত্রের প্রতি দর্শকের প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক। বিশেষ করে সামাজিক নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের জন্য একটি স্বপ্নীল পরিসর নির্মাণের চেষ্টা এই প্রদর্শনীতে বিদ্যমান। এই প্রদর্শনীর নেতির দিক হলো সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে যাচাই করলে ছবিগুলো শিল্পীর ব্যক্তিত্ব থেকে দূরের।

আমিনুর রহমান শিল্পীর ক্যাটালগে যে 'মহাজাগতিক ভুবন' বলেছেন, সেই ভুবনের ইঙ্গিত দেওয়ার মতো মানসিক আয়োজন শিল্পীর কাজের পেছনে সক্রিয় ছিল বলে মনে হয় না। ফলে যেসব ছবি মাধ্যম বা করণকৌশলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগে সাধারণ ও স্বাভাবিক চিত্রজ উপাদান দৃশ্যমান করে তোলে সেগুলোই শিল্পীর সার্থক প্রয়াস বলে মনে হয়।

প্রতিক্রিয়া

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

প্রথম আলোর 'শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী'র ২৬ এপ্রিল ২০০২ সংখ্যায় আহমদ রফিকের *ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও উত্তরপ্রভাব* গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে সৈয়দ আবুল মকসুদ যা বলেছেন, এর কিছু প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতে হয়।

সৈয়দ আবুল মকসুদ ভাষা আন্দোলনের ওপর '১৫০টির মতো বই' প্রকাশের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'প্রথম বইটি বেরিয়েছিল ১৯৫৩ সালে, মোহাম্মদ সুলতান কর্তৃক প্রকাশিত ও হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি*। এরপর দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ১৯৭০-এ প্রকাশিত হয় বদরুদ্দীন উমরের অসামান্য গ্রন্থ *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। স্বাধীনতার পর বেরোয় এটির দ্বিতীয় খণ্ড। হাসান হাফিজুর রহমান এবং বদরুদ্দীন উমরের তিনটি গ্রন্থ প্রকাশের পর যদি এ বিষয়ে একটি বইও না প্রকাশিত হতো তা হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। অধিকাংশই চর্বিত চর্বণ ও স্মৃতিকথামূলক। তবে এর মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থও রয়েছে। যে বিষয়ে এত বই বেরিয়েছে সে সম্পর্কে মানুষের জানতে এখন আর সম্ভবত কিছুই অবশিষ্ট নেই।' সৈয়দ আবুল মকসুদের এ বক্তব্যের মধ্যে তথ্যগত বিভ্রান্তি রয়েছে। প্রথমত, *একুশে ফেব্রুয়ারি* পূর্ববাংলার একুশে ফেব্রুয়ারি-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক জাগরণের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল সত্যি, তবু একে গ্রন্থ না বলে 'সংকলন' বলাই বোধ হয় সমীচীন হবে। এটি বেরও হয়েছিল সংকলন হিসেবেই। দ্বিতীয়ত, ১৯৭০ সালে বদরুদ্দীন উমরের *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* ('বাঙলা'র পরিবর্তে 'বাংলা' লেখা হয়েছে, জানি না এটা জনাব মকসুদের ভুল নাকি ছাপার) গ্রন্থের আগেও একটি গ্রন্থ বের হয়েছিল। সেটি হলো ভাষাসৈনিক আবুল কাসেম সম্পাদিত *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (পাকিস্তান তমুদ্দুন মজলিস, ঢাকা, ১৯৬৯)। এর মধ্যে আরো কিছু গ্রন্থ প্রকাশ পেয়ে থাকবে। তৃতীয়ত, হাসান হাফিজুর রহমান ও বদরুদ্দীন উমরের যে তিনটি গ্রন্থের কথা সমালোচক বলেছেন, তা ঠিক নয়। কারণ বদরুদ্দীন উমরের গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছিল তিন খণ্ডে (তৃতীয় খণ্ড, প্র. প্র. বইঘর, ১৯৮৫, চট্টগ্রাম)। এবং শেষোক্ত খণ্ডেই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করা হয়। চতুর্থত, সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থের তাৎপর্য বর্ণনা করেন। তৎপরবর্তী কালে প্রকাশিত 'কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ'র কথা বলে অধিকাংশ গ্রন্থকে তিনি 'চর্বিত চর্বণ' বলে মন্তব্য করেছেন, এ বিষয়ে অন্য কোনো গ্রন্থ প্রকাশকে তিনি অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করেছেন। এখানে একটি সূক্ষ্ম স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। বদরুদ্দীন উমর এক সাক্ষাৎকারে (মঞ্জু সরকার গৃহীত, *বই*, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা) তাঁর ওই তিনটি গ্রন্থ ছাড়াও দুটি কাজকে উল্লেখযোগ্য মনে করেন। সেগুলোর একটি বশীর আল্‌হেলাল রচিত *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* এবং অন্যটি পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত *ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি* শীর্ষক গ্রন্থমালা। অতএব, উক্ত কাজগুলোর কথা উল্লেখ না করে সাধারণ মন্তব্য করা সমীচীন নয়। পঞ্চমত, সমালোচক ভাষা আন্দোলনবিষয়ক আর কোনোকিছুর প্রকাশকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করেছেন। এটি কি কোনো ইতিহাস-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে? বদরুদ্দীন উমর ওই সাক্ষাৎকারেই বিনীতভাবে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, 'পরবর্তী সময়ের যোগ্যতর গবেষক-লেখকরা সেই সীমাবদ্ধতা উত্তীর্ণ হয়ে ভাষা আন্দোলনের ওপরে আরো ভালো কাজ করবেন।' বশীর আল্‌হেলাল তার *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*-এর 'ভূমিকা'য় এ গ্রন্থে মফস্বলের বিবরণের অপর্যাপ্ততার কথা স্বীকার করে বলেছেন, 'মফস্বলের ইতিহাস স্বতন্ত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।' এই দুই গুরুত্বপূর্ণ গবেষকের বক্তব্যের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের উত্তরোত্তর চর্চা ও গবেষণার ইঙ্গিত রয়েছে। এ আলোকে বেরিয়েছে আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস* (বাংলা একাডেমী, জুন ২০০২, ঢাকা)। এ গ্রন্থে দেশের পঞ্চাশটি জেলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে প্রবন্ধ রয়েছে। জেলাভিত্তিক ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও রয়েছে গোটা পাঁচেক। কিন্তু সম্পূর্ণ ইতিহাস তো আমরা এখনো পাইনি। তাই সৈয়দ আবুল মকসুদ যে বলছেন, এত বই প্রকাশের পর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের 'কিছুই অবশিষ্ট নেই' তা বোধ হয় পুনর্বিবেচনা করা দরকার। যতদিন না প্রতিটি জনপদের একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের ইতিহাস রচিত হবে, শওকত ওসমানের 'মৌন নয়' গল্পের হঠাৎ ক্ষোভে ফেটে পড়া বৃদ্ধের কথা বিবৃত হবে, ততদিন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সৈয়দ আবুল মকসুদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মামুন সিদ্দিকী
বাদুড়তলা, কুমিল্লা

ইলিয়াসের ডায়েরি প্রসঙ্গে

সম্প্রতি পত্রিকা মারফত জানতে পেরেছি আমার গ্রন্থনায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের যে ডায়েরিগুলো নাঈম হাসান সম্পাদিত *নিরন্তর* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে একটি প্রকাশনী। আরো জানতে পেরেছি গ্রন্থটিতে সম্পাদক হিসেবে জনৈক মাহবুব কামরান ও মুজিবুল হক কবীরের নাম যুক্ত করা হয়েছে। *প্রথম আলো* তাদের ২৬ এপ্রিল ২০০২ সংখ্যা 'শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী'তে বইটিকে একুশে বইমেলার দশটি নির্বাচিত মননশীল বইয়ের একটি হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং আলোচক বইটির সঙ্গে *নিরন্তর*-এর মিল এবং সম্পাদকের রহস্যময় ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রবাসে থাকার কারণে বইটি এখনো দেখা হয়নি আমার। কিন্তু জেনেছি *নিরন্তর*-এ প্রকাশিত আমার ভূমিকা ও টীকাসমেত ডায়েরিগুলোই হুবহু তাতে ছাপা হয়েছে। ব্যাপারটিতে আমি সীমাহীন বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ। কথিত ওই সম্পাদকদ্বয় এ ধরনের একটি গ্রন্থ প্রকাশের আগে গ্রন্থনাকারী হিসেবে আমাকে কিংবা *নিরন্তর*-এর সম্পাদককে কিছু জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। এ ডায়েরিগুলো প্রকাশে আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনার পূর্বাপর না জেনে, প্রকাশনার নৈতিকতার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে তথাকথিত সম্পাদকদ্বয় যে কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজটি করেছেন তা গুরুতর অন্যায়।

গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের ডায়েরির একটি সাহিত্যিক, সামাজিক এবং নৃতাত্ত্বিক মূল্য থাকে বলে ইলিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর ডায়েরিগুলো আমরা প্রকাশের উদ্যোগ নিই। ডায়েরির মতো একটি স্পর্শকাতর একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ ইলিয়াসের স্ত্রী সুরাইয়া ইলিয়াস আমার ও নাঈম হাসানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন দীর্ঘ পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার বিশ্বস্ততায়। এ ধরনের একান্ত ব্যক্তিগত রচনার পাঠোদ্ধার ছিল একটি দুরূহ কাজ। ডায়েরিগুলোর একটি সঠিক পাঠ নির্ণয়ের জন্য বিস্তর শ্রম ব্যয় করে ইলিয়াসের এগারোটি ডায়েরির প্রতিটি পৃষ্ঠা নিজ হাতে নতুন করে লিখে অনুলিপি তৈরি করেছিলাম। কখনো কখনো একেকটি অস্পষ্ট শব্দ উদ্ধারে ব্যয় হয়েছে প্রচুর সময়। মনে আছে ঊনসত্তর সালের ডায়েরিতে লেখা একটি স্লোগান উদ্ধার করতে শরণাপন্ন হতে হয়েছিল সে সময়কার রাজনীতিতে সক্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গে। ইলিয়াসের ডায়েরিতে রয়েছে প্রচুর সাহিত্যের উদ্ধৃতি। সেসব উদ্ধৃতির সঠিক শব্দটি খুঁজে পেতে যেতে হয়েছে মূল বইটির কাছে। এছাড়াও ডায়েরিতে এমন কিছু বিতর্কিত প্রসঙ্গ ছিল, যা ছাপানো সমীচীন হবে কিনা তা নিয়ে দ্বিধান্বিত থেকেছি। সম্পাদক নাঈম হাসানের সঙ্গে পরামর্শ করে আপাতত সেগুলো না ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাছাড়া পত্রিকার কলেবরের কথা বিবেচনা করে বেশ কিছু অংশ ছাপানো বাদ রেখেছি। ইলিয়াসের ডায়েরির সেই পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি আমার কাছে আছে। এছাড়া লেখক শিবিরের *তৃণমূল* পত্রিকাতেও তার একটি ভিন্ন ডায়েরির কিছু অংশ ছাপা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইলিয়াসের পরিবারের কাছে আছে তার মৃত্যুর আগের শেষ ডায়েরিটি। পরিকল্পনা ছিল আমাদের সংগৃহীত ডায়েরিগুলোর অপ্রকাশিত অংশসমেত অন্য ডায়েরিগুলো মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশের। কিন্তু কথিত ওই দুই সম্পাদকের বালখিল্যতায় সে পরিকল্পনা ভণ্ডুল হলো।

সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে কোনো সৌজন্য, নিয়মনীতির ধার না ধেরে অবলীলায় অন্যায় করার যে প্রবণতা রয়েছে সাহিত্য অঙ্গনেও সে ধরনের চর্চা দেখে আমি বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছি। একটি তৈরি ছাপানো বিষয়—যার পেছনে রয়েছে বিস্তর শ্রম—তাকে এভাবে বেমালুম কব্জা করে কোনো অনুমতি ব্যতিরেকে নিজের নামে ছাপিয়ে দেওয়ার এই প্রতারণার তীব্র নিন্দা জানাই। কথিত সম্পাদকদ্বয়কে বলি, বই প্রকাশের সাধ এবং সে বইয়ে নিজেদের নাম দেখার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো প্রয়াত সুধী একজন লেখককে বেছে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

শাহাদুজ্জামান
আমস্টারডাম

বিশ্বকবিতার ভূগোল

গত ১৯ এপ্রিল *প্রথম আলোর* 'শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী'তে ছিল সাম্প্রতিক বিশ্বকবিতার এক বিশুদ্ধ আয়োজন, নানা বর্ণ-গন্ধ-স্বাদের এক মনমাতানো ভোজ : 'মাতাল মানচিত্র'। ইউরোপ, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, এশিয়া—এই পাঁচ মহাদেশের ১১ জন কবির মোট ২১টি কবিতার সাবলীল ভাষায় ফুটে উঠেছে কবিদের নিজ নিজ সমাজের চালচিত্র। কবিতার এই মিছিলে কবিরা যেন গেয়েছেন অন্তর ও বহির্জগতের এক অভিন্ন স্বপ্নের গান।

'মাতাল মানচিত্র'-এর প্রতিটি কবিতাই ছিল স্বচ্ছ ভাষায় অনূদিত, কবিতাগুলোর মর্মে পৌঁছানো গেছে একেবারে সহজ আয়াসে। শামসুর রাহমানের অনুবাদে পোলিশ কবি তাদেউশ রোজেভিৎসের 'উত্তরজীবী' কবিতাটির কথাই ধরা যাক : 'আমি একজন শিক্ষক এবং দীক্ষাগুরুকে খুঁজি/যিনি আমার দৃষ্টি শ্রবণ আর

বাকশক্তি ফিরিয়ে দেবেন/যিনি আবার বস্তু এবং ভাবনার নামকরণে সক্ষম/যিনি অন্ধকারকে আলো থেকে আলাদা করতে পারেন'। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার কবি ডব্লিউ এস রেন্দ্রার শ্লেষাত্মক স্বরে জানিয়ে দেন পচনটা ক্ষমতার কোন কেন্দ্রে ঘটে : 'মানে এর একটাই, প্রেসিডেন্ট, তাই/দুর্নীতি করলেও কোনো ভয় নাই।' ক্ষমতা ও রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা ও ভণ্ডামি নিয়ে তীব্র শ্লেষের পরও রেন্দ্রা জানিয়ে দিতে ভোলেন না, 'বারান্দাতেও বটগাছ বেড়ে ওঠে'।

আবার বসন্তকে ভিন্ন ভিন্ন কবি কীভাবে তুলে ধরছেন আলাদা আলাদা তাৎপর্যে! মার্কিন কবি জন অ্যাশবেরি নিজের জন্য স্বপ্ন দেখছেন, 'দেখে যাব বসন্ত, নিদাঘ আর হেমন্তিকা'। আর রুশ কবি বেল্লা আখমাদুলিনা স্বপ্ন দেখছেন আরেকজনের জন্য : 'রাতের শব্দ যেন থাকে মোহময়/সেই নির্দেশ পাঠাব বসন্তকে।'

ব্যক্তিগত স্বপ্নের বিপরীতে বুকের গভীরে স্বদেশকে লালন করা স্বেচ্ছনির্বাসিত চীনা কবি বেই দাও কী গভীর মমতায় বলে ওঠেন : 'আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না আর/তোমার হৃদয়কে কম্পমান ম্যাপল পাতার মতো/ভরাতে চাই না আর লিখে লিখে বসন্তের মিথ্যা আশ্বাস।' এবং তারপরও কবি বলতে ভোলেন না : 'তবু যাই হোক না কেন, আমি বলতে চাই/দাঁড়াও মেয়ে/অপেক্ষা করো/লাল পাল তোলা নৌকা আর সঙ্গে সুবাতাসের জন্য।'

পরিশেষে সাজ্জাদ শরিফ আর আলতাফ হোসেনের অনুবাদের কথা না বললেই নয়। তাদের দুজনের অনুবাদে নিকারাগুয়ার কবি এরনেস্তো কার্দেনাল ও জাপানির কবি তানিকাওয়া শুনতারো মৃত্যুর অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা চিত্রার্পিত করেছেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবনা-কল্পনার নিরিখে। মেরিলিন মনরোর আত্মহত্যার সূত্রে পণ্যশাসিত সমাজ নিয়ে বেদনা ও মমতাভরা কবিতাটি তিনি শুরু করেছেন এভাবে : 'প্রভু, গ্রহণ করো এই মেয়েটিকে/সারা দুনিয়া যাকে মেরিলিন মনরো বলে ডাকে/যা ওর আসল নাম নয়/(কিন্তু তুমি জানো ওর আসল নাম, এতিম যে কিশোরীটি ধর্ষিত হয়েছিল নয়-এ)।' আর শুনতারো গড়ে তুলেছেন এক অ্যাবসার্ড জগৎ : 'আমি সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরে দেখি/বাবা দরজার সামনের সিঁড়িতে মরে পড়ে আছে/'অদ্ভুত সব ব্যাপার', আমি ভাবলাম/শবদেহের ওপর দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে দেখি/মা রান্নাঘরে, মৃত।...'আচ্ছা, এভাবেই যদি সবকিছু ঘটতে থাকে/আমার বড় ভাইটিও নিশ্চয় আর বেচে নেই।'/সত্যিই তা-ই, তাকে দেখতে পাই বাথটাবের মধ্যে মৃত।'

তানভীর আহমেদ হৃদয়
ঢাকা

সময়ের মুখ

দৈনিক *প্রথম আলোর* ১৪০৯ বঙ্গাব্দের নববর্ষ সংখ্যায় মঞ্জু সরকারের 'স্বতন্ত্র মানুষ' নামে একটি গল্প ছাপা হয়েছে। গল্পটিতে আমাদের বর্তমান সময়ের প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতির কুৎসিত দগদগে ঘা-অলা মুখের ফটোগ্রাফিক অথচ শিল্পিত একটি ছবি উঠে এসেছে। প্রাকৃতিক দূষণের মতো দেশের রাজনৈতিক দূষণও এখন সর্বব্যাপী, সরকারি অফিস-আদালতকেও তা রেহাই দেয়নি। পেশাজীবীদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মত-বিশ্বাস থাকতেই পারে কিন্তু তা যদি চাকরির বিধিমালাকে বুড়ো আঙুল দেখায় ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে তাহলে শঙ্কিত হতে হয় বৈকি। এ অবস্থায় ক্ষমতায় আসীন হয় যারা তাদের 'ভক্ত কুকুরদের' বিষাক্ত দাঁতের দংশন থেকে রেহাই পায় না চাকরিবিধি মেনে চলা দায়িত্বশীল নিরপেক্ষ পেশাজীবীও। যিনি বা যারা বলেন শিশু আর পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ হয় না, মানুষ সম্পর্কে তার বা তাদের ধারণা সীমাবদ্ধ। গল্পের আতাউল্লার মতো পেশাজীবী বা অন্য বৃত্তির মানুষ এ দেশে আরো আছেন, কিন্তু তারা এখন কোণঠাসা—নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত। আতাউল্লার মতো তাদেরও বুকে চিনচিনে ব্যথা হয় এবং ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণ ঘটে।

মঞ্জু সরকার যেভাবে সদর্থক ব্যঞ্জনায় গল্পটি শেষ করেছেন তাতে এটি আরো অসাধারণ হয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম আতাউল্লার সত্যিই মৃত্যু ঘটেছে এবং তার আত্মা মৃত্যু-পরবর্তী নিজের বাসভূমি ও অফিসের দৃশ্যাবলি দেখছে। কিন্তু গল্পের শেষে দেখা গেল তার মৃত্যু হয়নি, বরং ঘুম ভেঙে যাওয়া স্ত্রীকে তিনি বাঁচার পরম আকাঙ্ক্ষায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলছেন। গল্পকার যেন বোঝাতে চাইছেন আদর্শহীনতার ক্রুর আঘাতেও আদর্শরা সহজে মরে না। তবে তাদের পরিচর্যা দরকার। আতাউল্লাকে তাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা।

দেশের বিবেকবান লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা এই পরিচর্যায় এগিয়ে আসুন। দেশের স্বার্থে এগিয়ে আসাটা জরুরি।

সাহসিক ও কাঙ্ক্ষিত এই গল্পটি রচনা ও প্রকাশের জন্য গল্পকার ও সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই।

শুভ্রব্রত
খুলনা

গিদ্‌দিগন্তর

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

রোপা আইন

কোরানশরিফের সুরা হুজুরাতের ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।'

সুরা মায়িদার ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিআত (আইন) ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (তা করেননি)। তাই সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো।'

সুরা হজ-এর ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি নিয়মকানুন যা ওরা পালন করে। সুতরাং ওরা যেন তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে।'

একটা আইনব্যবস্থার ইতিহাস অনেকাংশই অন্যান্য আইনি ব্যবস্থা থেকে আইনি মালমশলা ও তার গ্রহণ স্বাঙ্গীকরণের ইতিহাস। প্রকৌশলের মতো আইন মানবিক অভিজ্ঞতারই ফল। আইনি কলাকৌশল হয়তো মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক বা জাতি প্রথমে প্রণয়ন করে এবং পরে ব্যবহারের অভিজ্ঞতায় তা অন্যরাও গ্রহণ করে। আইনকে সাধু বাংলায় ব্যবহারই বলা হয়।

যখন রাজার রাজত্ব ছিল তখন রাজার ধর্ম ও রাজার আইন রাজার শাসনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাকে মেনে চলতে হতো। বিদেশী রাজার সঙ্গে তার আইনের অনুপ্রবেশ ঘটে। আবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েও ভিনদেশী আইন স্বাধীন দেশ গ্রহণ করে। আধুনিকীকরণের মাধ্যম অনুযায়ী তুরস্কে ও জাপানে ঢালাওভাবে বিদেশী আইন দুবাহু বাড়িয়ে গ্রহণ করা হয়। তুর্কিরা সুইস ও জার্মান আইন আমদানি করে। ভিয়েতনামে চীন, ফরাসি, সোভিয়েত, মার্কিন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের আইন নিয়ে গ্রহণ-বর্জনের পরীক্ষা চলেছে। বিংশ শতাব্দীতে রাজার শাসন অনেক দেশে উঠে গেলেও রাজনৈতিক প্রভাবে ভিন দেশের আইন মানুষ মেনে নিয়েছে।

সারা পৃথিবী আজ বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য চুক্তি, বিরোধনিষ্পত্তি, সালিশ, কোম্পানি, বহুজাতিক কোম্পানির আদল প্রায় এক রকম হতে চলেছে। সারা বিশ্বব্যাপী সম্পূর্ণ এক জাতীয় আইন হয়তো এখনো সম্ভব নয়। তা আকাঙ্ক্ষিতও নয়।

মানুষের মধ্যে দেশীয় আইনের প্রতি এমনকি আঞ্চলিক আইনের প্রতি এমন এক মমত্ববোধ থাকে যে, ব্যবহারিক সুবিধার্থে মানুষ অনেক সময় সমরূপত্বকে স্বাগত জানায় না। পারিবারিক আইনে বিদেশী আইনের প্রভাব সবচেয়ে কম পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানের পারিবারিক আইন ব্রিটিশ আমলে তেমন পরিবর্তিত হয়নি। হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্যোগে কিছু কিছু হিন্দু আইন পরিবর্তিত হয়। সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটে।

মুসলমান পারিবারিক আইনে বিবাহ ও তালাকের ওপর কিছু আইন হয়। পাকিস্তান আমলে মুসলমানদের বহুবিবাহ প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন না করে কিছু আইনগত বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়। পারিবারিক আইনের ভিত্তি প্রায়শ ধর্ম। আয়ারল্যান্ড, ইসরায়েল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের পারিবারিক আইনের ওপর বিদেশী আইনের প্রভাব কম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চাশ অঙ্গরাজ্যের আইন পঞ্চাশ রকমের। ফেডারেল আইন অবশ্য সর্বত্র সমান। সেই দেশে কোনো অঙ্গরাজ্যের আদালতে আইন ব্যবসা করতে চাইলে সেই অঙ্গরাজ্যের আইনে জ্ঞান, যোগ্যতা ও পারদর্শিতার প্রমাণ দিতে হবে।

ব্রিটেনের মতো ছোট্ট দেশে একটি পার্লামেন্ট থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস-এ ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রচলিত। নিজস্ব আইনের প্রতি মানুষের মমত্ববোধের কারণে আইনের জগতে বৈচিত্র্যের সহসা অবসান ঘটবে না, যদিও ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দেশের আইনের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বৃদ্ধি পাবে।

রোমান আইনের ওপর গ্রিক প্রভাব নেই বললেই চলে। কোনো কোনো দেশ অন্য দেশের সভ্যতা গ্রহণ করেছে কিন্তু আইন নিজের মেধা অনুযায়ী প্রণয়ন করেছে। বড় ধরনের আইনি উন্নয়নের সময় বিদেশ থেকে ধার করতে দেখা যায়। আবার একটা দেশ অন্য দেশ থেকে আইন আমদানি করেও বেশ স্বকীয়তার পরিচয় দেয়। স্কটল্যান্ডের বহু আইন বাইরে থেকে আহরিত। সেই স্কটল্যান্ডে ১৪২৪ সালে দেওয়ানি পাঁপরের মামলায় আইনি সাহায্যের আইন তৈরি হয় যখন ইউরোপের কোনো দেশে নিঃস্ব ব্যক্তিকে আইনি সাহায্য দেওয়ার কোনো ধারণার বিকাশই ঘটেনি।

জেরেমি বেনথাম তাঁর *অফ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অব টাইম অ্যান্ড প্লেস ইন ম্যাটার্স অব লেজিসলেশান* (আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কাল ও স্থানের প্রভাব) গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বলেন, 'প্রথমত, ইংরেজি আইনের প্রকৃতি বেশি-রভাগের এমনই, যে প্রতিটি ব্যাপারেই তা মন্দ; দ্বিতীয়ত, শুধু তাই নয়, ইংল্যান্ডের চেয়ে তা বাংলাদেশে আরো খারাপ; তৃতীয়ত, বাংলাদেশের জন্য আরো ভালো, এমনকি ইংল্যান্ডের জন্যও আরো ভালো হতে পারে এমন এক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যেতে পারে। আইন রোপণের সময় এর জন্য আইন প্রবর্তন করা যায়।'

কোনো কোনো দেশ বেশ সহজে বিদেশের আইন রপ্ত করতে পারে। এ ব্যাপারে জাপানিদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ *জাপান-যাত্রীতে* বলেছেন :

> য়ুরোপের কামান বন্দুক, কুচ-কাওয়াজ, কল-কারখানা, আপিস-আদালত, আইন-কানুন যেন কোন্ আলাদিনের প্রদীপের জাদুতে পশ্চিমলোক থেকে পূর্বলোকে একেবারে আস্ত উপড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়; তাকে ছেলের মতো শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ করে তোলা নয়—তাকে জামাইয়ের মতো একেবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ করে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে তুলে আর-এক জায়গায় রোপণ করবার বিদ্যা জাপানের মালীরা জানে; য়ুরোপের শিক্ষাকেও তারা তেমনি করেই তার সমস্ত জটিল শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যেই খাড়া করে দিলে। শুধু যে তার পাতা ঝড়ে পড়ল না তা নয়, পরদিন থেকেই তার ফল ধরতে লাগল। প্রথম কিছুদিন ওরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে—কেবল পালটা এমন আড় করে ধরেছে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পুরো এসে লাগে।
>
> ইতিহাসে এত বড়ো আশ্চর্য ঘটনা আর কখনো হয় নি। কারণ, ইতিহাস তো যাত্রার পালা গান করা নয় যে, ষোলো বছরের ছোকরাকে পাকা গোঁপদাড়ি পরিয়ে দিলেই সেই মুহূর্তে তাকে নারদমুনি করে তোলা যেতে পারে। শুধু য়ুরোপের অস্ত্র ধার করলেই যদি য়ুরোপ হওয়া যেত, তাহলে আফগানিস্তানেরও ভাবনা ছিল না। কিন্তু, য়ুরোপের আসবাবগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করবার মতো মনোবৃত্তি জাপান এক নিমেষেই কেমন করে গড়ে তুললে, সেইটেই বোঝা শক্ত।
>
> সুতরাং এ-কথা মানতেই হবে, এ জিনিস তাকে গোড়া থেকে গড়তে হয় নি, ওটা তার একরকম গড়াই ছিল। সেইজন্যেই যেমনি তার চৈতন্য হল অমনি তার প্রস্তুত হতে বিলম্ব হল না। তার যা-কিছু বাধা ছিল সেটা বাইরের; অর্থাৎ, একটা নতুন জিনিসকে বুঝে পড়ে আয়ত্ত করে নিতে যেটুকু বাধা সেইটুকু মাত্র; তার নিজের অন্তরে কোনো বিরোধের বাধা ছিল না।

ভারতে মুসলমান আমলে অগ্রক্রয় বা হকশুদার-আইন প্রচলিত হয়। ব্রিটিশ আমলে ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে—হেবিয়াস কর্পাস রিট আবেদন করার অধিকার। ব্রিটিশ ভারতে বিদেশী প্রশাসকরা প্রথম দিকে দেশে প্রচলিত পারিবারিক আইন ও কিছু রীতি-রেওয়াজ স্বীকার করে নেন। তারা স্পর্শকাতর ধর্মীয় আইনে কোনো হস্তক্ষেপ করতে চাননি। কিন্তু তারা নেটিভ বা দেশীয় আইন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে দুটি সমান্তরাল আইনি ব্যবস্থা চালু রাখতে চাননি। বিশেষ করে আদালতে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তনের পর ফৌজদারি আইন সকল ধর্মের প্রজার জন্য এক করা হয়। মক্কেলের প্রতিনিধিত্ব করার ওকালতি পেশার উদ্ভব হলো। আইনের বিশ্লেষণে তুলনামূলকভাবে অধিকতর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ইংরেজি নজির প্রথাও চালু হলো।

অন্যান্য উপনিবেশে যেখানে প্রতিষ্ঠিত সরকার বা আইনি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল না সেখানে ইংরেজরা তাদের কমন ল প্রবর্তন করার চেষ্টা করে। ভারত ঠিক ইংরেজদের উপনিবেশ ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের ব্যবসার স্বার্থে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে প্রায় শুরু থেকে এবং তা বজায় রাখে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত যখন কোম্পানির রাজত্বের অবসান ঘটে। দৈনন্দিন কাজের জন্য ন্যায়সঙ্গত আইন, জাহাজে নাবিকদের মধ্যে শৃঙ্খল রক্ষার জন্য সামরিক আইন, মুদ্রা খোদাই ইত্যাদির অধিকার কোম্পানিকে ব্রিটিশ রাজকীয় সনদে দেওয়া হয়। জমিদার হিসেবে দেশীয় প্রথা অনুযায়ী আংশিক বিচারকার্যও কোম্পানিকে পালন করতে হয়। সিপাহি বিদ্রোহ দমনের পর ভারতের শাসনভার সরাসরি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করল।

১৮৩৩ সালের অ্যাক্টে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়। আইন কমিশনের বিধান দেয়। মেকলে ভারতীয় দণ্ডবিধি মুসাবিদা করেন ১৮৩৭ সালে। তা সংবিধিবদ্ধ আইন হয়ে বলবৎ হয় ১৮৬০ সালে। এশিয়া ও আফ্রিকায় বহু ব্রিটিশ উপনিবেশ এই দণ্ডবিধি আইন অনুসরণ করে। একাধিক আইন কমিশনের উদ্যোগ ও প্রস্তাবে চুক্তি, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর, খ্রিস্টানদের বিবাহ, বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, অসবর্ণ বিবাহের বিধান, কোম্পানি, ফ্যাক্টরি, বৈদেশিক মুদ্রা, বিস্ফোরক দ্রব্য ইত্যাদি বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, টর্ট (Tort)-এর ওপর কোনো আইন পাস করা হয়নি। স্যার ফ্রেডরিক পোলক একটা বিলের মুসাবিদা রচনা করলেও তা শেষ পর্যন্ত আইন হয়নি। পরিবর্তে ইংল্যান্ডে প্রচলিত টর্ট আইনের দিকনির্দেশনা সুবিচার, সুনীতি ও সুবিবেকের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্রিটিশ ভারতের আদালতে বিবেচনা করা হয়।

যেখানে আইনের অভাব বা ফাঁক দেখা যেত সেখানে আদালতে সুবিচার, সুনীতি ও সুবিবেক অনুযায়ী বিচার করা হতো। ১৮৮৭ সালে *ওয়াঘেলা বনাম শেখ মসলুদিন (১৮৮৭)* মামলায় ধার্য করা হয় যে, জাস্টিস, ইক্যুটি ও গুড কনসায়ান্স বা সুবিচার, সুনীতি ও সুবিবেক বলতে ভারতীয় সমাজ ও পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি আইনকে বোঝানো হবে।

ভারতে ব্রিটিশ কৃত আইনকে বিদেশী ও ঔপনিবেশিক আইন বলে চিহ্নিত করে অনেক সমালোচনা হয়েছে। আমাদের দেশেও ঔপনিবেশিক আইন পরিবর্তন করার মাঝে মাঝে আওয়াজ ওঠে। কিন্তু সেই উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য যে মানসিকতা এবং পরিশ্রমের প্রস্তুতির প্রয়োজন তার অভাব রয়েই যায়। ভারতীয় আইন কমিশন ইংরেজ প্রবর্তিত আইনকে দেশের আইন বলে অভিহিত করেছে। পাকিস্তানে হামুদুর রহমান আইন কমিশন উক্ত মত সমর্থন করেছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতার আইন ১৯৪৭ পাস হওয়ার পর পরবর্তী সাংবিধানিক পরিবর্তনের মধ্যেও ১৯৪৭-পূর্ব প্রচলিত আইনের ধারাবাহিকতা প্রায় অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ফলে স্থানবিশেষে পুরনো আইনের রদবদল হয়েছে এবং কোথাও কোথাও সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ইংলিশ কমন ল, ইংরেজের আইন এবং বিচার ব্যবস্থার প্রভাব উপমহাদেশে এখনো বিদ্যমান। স্বাধীন ভারতে হিন্দু পারিবারিক আইনে পরিবর্তন এনে হিন্দু কোড প্রবর্তিত হয়েছে। সেখানে যেমন একদিকে বিবাহে অবশ্যপালনীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে শাস্ত্রীয় সপ্তপদীর বিধান রয়েছে, তেমনি বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে যেখানে শাস্ত্রীয় বিধানের কোনো নির্দেশনা ছিল না, সেখানে পশ্চিমী বা ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবান্বিত নতুন বিধিবিধানের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।

হিকমতে চীনাদের কারবারই আলাদা। তারা এক আইনি বিপ্লবের উদ্যোগ নিয়েছে। মাত্র দু'দশকের আইনি পেশার অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা করে তারা একেবারে কেঁচেগণ্ডুস করে একটা আইনি কাঠামো নির্মাণ করার চেষ্টা করছে। বিচারকদের গুণাবলী ও সততা থেকে শুরু করে আসামি-বিবাদী ও তাদের আইনজীবীদের স্বার্থরক্ষার্থে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

চীনারা যেদিকে একবার ঝোঁক দেয় সেদিকে তাদের উৎসাহে সহজে ভাটা পড়ে না। তারা ইংল্যান্ডের আইনি পোশাকের উইগ্, উইংকলার, ব্যান্ড, গাউন ইত্যাদির সঙ্গে জুরিপ্রথা সম্পর্কেও কৌতূহল প্রদর্শন করছে। চীনা সরকারের আমন্ত্রণে বহু বিদেশী আইনজ্ঞ ও বিচারক ইতিমধ্যে চীন ঘুরে গেছেন। ব্রিটেনের প্রধান বিচারপতি লর্ড ওলফ চীনাদের উৎসাহ দেখে বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেন, 'যা আমাকে অভিভূত করে তা হচ্ছে সংস্কারের বিরাটত্ব—যা সম্ভ্রমোদ্দীপক এবং বেশ নাটকীয় বলতে হবে। একটি ইউরোপিয়ান অধিক্ষেত্রে এমন বহরের পরিবর্তনের ঘটনা অসাধারণ বলে মনে হবে।'

হংকংয়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল প্রসার অন্যান্য কারণের সঙ্গে সেখানকার নির্ভরযোগ্য আইনি কাঠামোর কথা এসে যায়। সেই আইনি কাঠামোর পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার জন্য হংকং চীনা প্রজাতন্ত্রের কাছে হস্তান্তর করার আগেই ৪৩ জন চৈনিক পণ্ডিত হংকংয়ের সব ইংরেজি আইন চীনা ভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু করে দেয়। নিজের মাতৃভাষায় আইন স্বাঙ্গীকৃত না হলে তা জনগণের মজ্জাগত হবে না, এই সহজ তত্ত্বটা চীনারা সহজেই বুঝেছে।

যে দেশের নাগরিককে আইন বুঝতে, প্রয়োগ করতে এবং তার আশ্রয় নিতে পরভাষার দ্বারস্থ হতে হয় পদে পদে তাকে নানাবিধ বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হবে।

আমাদের কোম্পানি আইনের বাংলা অনুবাদে বিলম্ব হওয়ায়, আইনটির ইংরেজি ভাষ্য চটজলদি প্রকাশিত না হওয়ায় দেশের অনেক আইনজীবী বড়ই বিসদৃশ মাতম করেছে। আমাদের হীনম্মন্যতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী পরামর্শদাতারা বলছেন, ইংরেজিতে সবক নিলে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে আমাদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে। আসলে দেশের সব কাজ ইংরেজিতে হলে বিদেশীর অনেক কাজ কমে যায়। ইংরেজিতে লিখিত আইনের ব্যাখ্যায়ও বিদেশী বক্তব্য ও ভাষ্য সহজে তুলে ধরে অসম প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ বেশি থাকে।

এক সময় মনে করা হতো পূর্ব এশিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইনের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, ভারত, জাপান, মালয়েশিয়া, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র ও তাইপে ছয়টি এশীয় দেশের উপর একটি অনুসন্ধান চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, ১৯৬০-১৯৯৫ সালের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পূর্ব এশিয়ার আর্থনৈতিক উন্নয়নে আইনের ভূমিকা মোটেই নগণ্য নয়।

উপরোক্ত ছয়টি দেশই তাদের প্রায় পুরো আইনি কাঠামো পশ্চিম দেশ থেকে গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন দেশের আইনি সংহিতায় পশ্চিম থেকে আহরিত আইনগুলোর অধিকাংশ এখনও বিদ্যমান। তবে দেশে যখন কর্তৃত্ববাদী সরকার অধিষ্ঠিত থাকে তখন কাজেকর্মে কেতাবি আইনকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে প্রণীত আইন-বিধি-নিয়ম অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে।

ইউরোপীয় অভিজ্ঞতায় এটা ধরে নেওয়া হয় যে, আইন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটা তাৎপর্যময় সম্পর্ক রয়েছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে আইনি পরিবর্তনের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। ঐতিহাসিক প্রমাণের হেরফের থাকলেও এই ধারণার তাত্ত্বিক গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়নি। এর প্রধান কারণ, পশ্চিমে পুঁজিবাদের উত্থান এবং অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানে পশ্চিমী গবেষকদের প্রভাব।

সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবে এশিয়ায় আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আইনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে পারেনি। বিদেশী আইন গ্রহণ করার পরে দেখা যায় বহুদিন সেই রোপা আইন ব্যবহার করা হয়নি।

বর্তমান যুগে উন্নয়নশীল দেশে কাট অ্যান্ড পেস্ট অর্থাৎ কেটে জোড়া দিয়ে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। অনেক সময় আইন দেশের সংবিধিবদ্ধ আইনের বইয়ে থাকে, ব্যবহার হয় না তেমন।

গত দুই দশকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রসার ও বৃদ্ধির ফলে আইনের অধিকতর ব্যবহার ও কার্যকরতার দিকে বেশ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে এবং সেই ব্যবসা হতে উদ্ভূত বিরোধ-নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে মোটামুটি একই ধরনের আইনের বিকাশ লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের প্রধান বা মৌল আইনকে এক সময় বাংলায় শাসনতন্ত্র বলা হতো। এখন আমরা ইংরেজি কনস্টিটিউশানের বাংলা করেছি সংবিধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পূর্বে পৃথিবীতে লিখিত সংবিধানের রেওয়াজ ছিল খুব কম। তবে যেসব দেশের মৌলিক আইন অলিখিত ছিল সেসব দেশেও লিখিত আইনের পরিসর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়। উপনিবেশ-বিমুক্তির পর বহু নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এখন জাতিসংঘের সদস্য ১৮৮টি রাষ্ট্র। এসব রাষ্ট্রের সংবিধান যেখানে রাষ্ট্রপতিপ্রধান সেখানে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রভাব রয়েছে। আবার যেসব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধান দেওয়া হয়েছে সেখানে ব্রিটিশ অলিখিত সংবিধানের অলিখিত রেওয়াজগুলোকে লিখিতভাবে আত্মীকরণ করা হয়েছে। ফরাসিরা ষোলটি সংবিধানের জন্ম দিয়েছে। ফরাসি রন্ধনশিল্পের সঙ্গে ফরাসি সংবিধান রপ্তানি পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতা করে। আফ্রিকায় ফরাসি-ভাষী এলাকায় ফ্রান্স এবং ইংরেজি-ভাষী এলাকায় ইংল্যান্ডের আইনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

রোপা আইন বা সংবিধানে আকাঙ্ক্ষিত ফল অনেক সময় পাওয়া যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের আদল গ্রহণ করা সত্ত্বেও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশে তেমন আইনী সুফল বয়ে আনেনি। আইন বা সংবিধানের কার্যকারিতা অনেকাংশে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করে।

আজকাল আন্তর্জাতিক আইনের নানাবিধ বিষয় দেশের অভ্যন্তরীণ আইনে স্বাঙ্গীকৃত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পৃথিবীর প্রায় ৯০টি দেশের সংবিধানে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অঙ্গীভূত হয়েছে। আমাদের দেশের মানবাধিকারের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, 'কাজীর গাই খাতাতে আছে, গোয়ালে নাই' এই কথার কী অর্থ!

মাসুদা ভাট্টি

ব্রিটিশ দলিলে একাত্তর

হিথের 'রক্তপাত' শব্দে ইয়াহিয়ার গোসসা

পর্ব : ১, কিস্তি : ২

অত্যন্ত গোপনীয়
পাকিস্তান পরিস্থিতি রিপোর্ট
সকাল ১০টা ১ এপ্রিল ১৯৭১

১. আমাদের ঢাকাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনার প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী এটা এখন স্পষ্ট যে, গত বৃহস্পতিবার রাতে সেনাবাহিনী নামার পর থেকে ঢাকায় বিপুলসংখ্যক নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা করা হয়েছে। পাঞ্জাবি সৈন্যরা শহরে ও শহরের বাইরে বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপকসংখ্যায় হত্যা করেছে। আওয়ামী লীগ সমর্থকদের খুঁজে এনে হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের খোঁজ করা অব্যাহত রয়েছে।

২. পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত বলা চলে কারণ সেনাবাহিনী গণহত্যা আপাতত বন্ধ রেখেছে। কিন্তু বিহারি-রা (অবাঙালি ও উর্দুভাষীরা) উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং সেনাবাহিনীরা চোখ বন্ধ করে রাখায় তারা সে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ঢাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে, পাকিস্তান সরকারের এ বিবৃতি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক। কারণ কোনো দোকানপাট খোলেনি এবং কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার লেনদেনের খবর পাওয়া যায়নি। এতে মনে হচ্ছে, অন্যান্য শহরেও একই অবস্থা বিরাজ করছে যাকে সেনাবাহিনী শান্ত পরিস্থিতি বলে প্রচার করছে।

৩. ঢাকা থেকে ১ এপ্রিল ডেপুটি হাইকমিশনারের অ্যাসিস্ট্যান্ট মিলিটারি অ্যাডভাইজারের পাঠানো এক রিপোর্টে জানা গেছে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। তিনি মনে করেন, সেনাবাহিনী ঢাকার বাইরে অকল্পনীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। এক রিপোর্টে জানা গেছে, সিলেটের পশ্চিমাংশ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে চলে গেছে। ঢাকার সঙ্গে বাইরের সড়ক যোগাযোগ এখনো বিচ্ছিন্ন। বেশিরভাগ টেলিফোন সংযোগ কাজ করছে না।

৪. ভারতে পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের জন্য জনসমর্থন বাড়ছে। ৩১ মার্চ কোনো রকম বিরোধিতা ছাড়াই লোকসভা বাঙালির জন্য একটি শক্তিশালী মৌখিক প্রস্তাব পাস করেছে। তাতে বলা হয়েছে, 'পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব বাংলায় পরিকল্পিতভাবে মানুষ হত্যা—যা গণহত্যায় রূপ নিয়েছে—অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য পৃথিবীর মানুষ ও রাষ্ট্রকে সোচ্চার হতে হবে।' প্রস্তাবে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বাঙালিরা তাদের এ সংগ্রামে নিশ্চিত জয়লাভ করবে এবং এ সংগ্রামে ভারতের জনগণের পূর্ণ সাহায্য ও সহানুভূতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করা হয়েছে।

৫. ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার ও ইউএস কনসাল জেনারেল ৩১ মার্চ ঢাকার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তরের সিভিল অ্যাফেয়ার্সের দায়িত্ব পালনকারী রাও ফরমান আলীর সঙ্গে তার সদর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ব্রিটিশ ইউএন অফিসিয়াল প্রদত্ত এক রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে নিশ্চিত করেন যে, সকল ব্রিটিশ নাগরিক ও অন্যান্য বিদেশী নাগরিক চট্টগ্রামে নিরাপদ অবস্থানে রয়েছেন, ব্রিটিশ ও মার্কিন মিশনের চট্টগ্রাম পরিদর্শনের ব্যাপারে রাও ফরমান আলী রাজি হন। তিনি বলেন, পরিদর্শন কখন সম্ভবপর হবে এ ব্যাপারে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

৬. জেনারেল ফরমান এ ব্যাপারে একমত হন যে, দেশত্যাগকারীদের সংখ্যাধিক্য কমানোর চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য এ ব্যাপারে তাকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক টিক্কা খানের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর ব্যবস্থা নিতে হবে।

(পাকিস্তান ইমার্জেন্সি ইউনিট)
১ এপ্রিল ১৯৭১।

অত্যন্ত জরুরি ও গোপনীয়
ইসলামাবাদ থেকে টেলিগ্রাম
ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস, ২৯ মার্চ ১৯৭১
পূর্ব পাকিস্তান

১. পরিস্থিতি কেন এমন হলো সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আগে আরো কিছু সময়ের প্রয়োজন। ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে জনমনে পরস্পরবিরোধী ধারণা রয়েছে। ভুট্টোর ভূমিকা এখনো পর্যন্ত ঘোলাটে। তবে পরিস্থিতির ব্যাখ্যায় এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি এ মাসের প্রথমেই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ঢাকায় আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণের খেলা খেলেছেন যাতে সেনাবাহিনী তাদের পরিবারবর্গকে সরিয়ে নিতে পারে, সামরিক শক্তি বাড়াতে পারে এবং একটি নীলনকশা প্রণয়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়। আমি মনে করি, এখনো পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট একটি সমঝোতার ব্যাপারে আশাবাদী হলেও মুজিবের অনমনীয়তার কারণে তার ধৈর্যের বাঁধ ক্রমশ ভেঙে পড়ছে এবং শেষ পর্যন্ত অপমানের প্রতিশোধ নিতে তিনি প্ররোচিত হবেন।

আমাকে দেওয়া (ব্রিগেডিয়ার) আহসানের তথ্য মোতাবেক মুজিব একজন অতিসাধারণ আবেগপ্রবণ ও দুর্বল মানুষ, যিনি মনে করে তার মাথায় দুটি পিস্তল ঠেকানো রয়েছে। একটি পিস্তল তার উগ্র সমর্থকদের হাতে যা ঠেকানো দুষ্কর এবং যা ক্রমশই তার হাতের নাগাল থেকে দূরে সরে গেছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোভাব সত্যিকার অর্থেই উদ্বেগজনক। পাঞ্জাবি ও পাঠানরা বাঙালিদের ব্যাপারে ক্রমাগত ফুঁসে উঠছে এবং তারা সব সময়ই বাঙালিদের উচিত 'শিক্ষা' দেওয়ার কথা বলছে।

২. আমাদের কাছে পরিষ্কার রিপোর্ট পৌঁছেছে যে, সেনাবাহিনী সেখানে (বাঙালিদের) জীবনের প্রতি কোনো ধরনের মমত্বই প্রদর্শন করছে না। বাঙালিদের ভয় দেখানোর জন্য তারা চরম সন্ত্রাসী পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে খুঁজে এনে হত্যা করা হচ্ছে (পাকিস্তানের ইতিহাসে এ রকম নজির নেই)। আমি জানার অপেক্ষায় আছি, বেশির ভাগ আওয়ামী লীগ নেতাকেই মেরে ফেলা হয়েছে কি না। মুজিব সম্পর্কে জেনারেল আকবরের (আমাকে টেলিফোনে জানানো) মন্তব্য, যদি সমস্ত সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে আমি তার জীবন নিয়ে শঙ্কা বোধ করছি।

৩. ঢাকা ও চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ না থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসবে বলে আমার মনে হয় না। বাঙালির নেতৃত্ব চলে যাবে আন্ডারগ্রাউন্ডের উগ্রপন্থীদের হাতে। পরিস্থিতি একটু শান্ত হয়ে আসার পর থেকেই প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হবে বলে মনে হয়। প্রায়ই তা হয়তো ছোটখাটো ডাকাতির মতো মনে হবে এবং সেটি চলতে থাকবে অনির্দিষ্টকাল ধরে। প্রবেশ ঘটবে নকশালপন্থী এবং অস্ত্রের। অর্থনৈতিক জীবন প্রবলভাবে অসংগঠিত হয়ে পড়বে। ধনী ও বিদেশী নাগরিকেরা বিপজ্জনকভাবে আক্রান্ত ও অপহৃত হবেন। সন্দেহ নেই, সেনাবাহিনী বিশ্বাস করে যে কিছুসংখ্যক ষড়যন্ত্রকারীকে জনগণের মধ্যে থেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে যারা পাকিস্তানের অংশ হয়ে থাকতে চায় তারা সহযোগিতা করবে। তবে আমার ধারণা, প্রতিরোধের তীব্রতা বেড়ে গেলে সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্টের নিরাপদ অবস্থান বেছে নেবে এবং এমন মানসিকতা পোষণ করবে যে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিজেকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করুক। আর এটা সর্বাংশেই সত্য প্রমাণিত হবে।

(স্যার পিকার্ড রিপোর্ট : পাকিস্তান পলিটিক্যাল ক্রাইসিস, ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস, সাউথ এশিয়ান ডিপার্টমেন্ট)

পর্ব : ২, কিস্তি : ১

ভূমিকা

আগের পর্বে আমরা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথকে লেখা ইয়াহিয়ার চিঠি ও অন্যান্য কিছু দলিল হাজির করেছিলাম। এ পর্বে আমরা তুলে ধরলাম প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথের উত্তর, স্যার সিরিল পিকার্ডের সঙ্গে ইয়াহিয়ার সাক্ষাৎকার এবং ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত মিয়া আরশাদ হুসাইনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথের সাক্ষাৎকারের বিবরণ। এখানেই ইয়াহিয়া তার বার্তায় প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ কথিত পূর্ব পাকিস্তানে 'রক্তপাত' শব্দটিতে গোসসা প্রকাশ করেছে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুকে চটানো যাবে না বলে স্যার সিরিল পিকার্ডের সঙ্গে সাক্ষাতে ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন মাত্র। কারণ ইয়াহিয়া জানতেন, বাঙালিহত্যায় প্লাবিত রক্তস্রোত সাতসমুদ্রপারের টেমসের জলকেও রাঙিয়ে তুলেছে। তাই জ্বলজ্যান্ত সত্যকে ঢাকতে চেয়েছেন চরম মিথ্যাচার দিয়ে। বারবার তাই শেখ মুজিবের নামে কুৎসা বর্ণনা করেছেন স্যার সিরিল পিকার্ডের কাছে, এমনকি মিয়া আরশাদ হুসাইনকে দিয়েও এ কাজটি করিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, ইয়াহিয়ার অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গরাও বারবার করে বলছে, মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার দাবি করেই সমস্ত ভণ্ডুল করে দেন। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার স্থায়ী সমাধানে যে পাকিস্তানের জন্ম, তাকে মুজিব পুনরায় ভাঙতে চেয়ে মহাপাতকের কাজ করেছেন। অতএব তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। শাস্তির ব্যাপারটি প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথকে এমন উদ্বিগ্ন করে তোলে যে তিনি প্রটোকল ভেঙে বারবার শেখ মুজিবসহ সকল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে ইয়াহিয়ার রোষানল থেকে মুক্ত করতে ব্রতী হয়ে পড়েন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথের ব্যক্তিগত টেলিগ্রাম বার্তা

গত ৩১ মার্চ লন্ডনে নিযুক্ত আপনার হাইকমিশনার কর্তৃক হস্তান্তরকৃত বার্তার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমি জানি, একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছার জন্য আপনি আপনার যথাসাধ্য করেছেন এবং এটাও বিশ্বাস করি যে, পরিস্থিতি যে দিকে মোড় নিয়েছে তাতে আপনি যারপরনাই উদ্বিগ্ন। যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে আপনি বর্তমানে যাচ্ছেন, তা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু সকল পাকিস্তানির কল্যাণের জন্য যত শিগগির সম্ভব এই রক্তপাত ও শক্তি প্রয়োগ বন্ধ হওয়া ও আলোচনায় বসা উচিত। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

আমি এটাও মনে করি যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যাদের প্রতি জনগণের বিপুল আস্থা রয়েছে, তাদেরও এই আলোচনায় অংশ নেওয়া উচিত। ৩১ মার্চ আপনার হাইকমিশনার আমাকে বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান জেলহাজতে নিরাপদ রয়েছেন। আপনার ব্যক্তিগত ও পাকিস্তানের বন্ধু হিসেবে আমি কি আপনাকে এই পরামর্শ দিতে পারি যে, এই সংকটকালে আপনি যদি জনসম্মুখে তাঁর এবং অন্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করেন, তাহলে আন্তর্জাতিকভাবেও আপনি প্রশংসিত হবেন। আমাকে পাঠানো আপনার বার্তায় আপনি ভারত সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমরা মনে করি বর্তমান সমস্যায় অন্য কোনো রাষ্ট্রের নাক গলানোয় সমস্যা বরং আরো বাড়বে। আমাদের এই মনোভাব সম্পর্কে ভারত সম্পূর্ণ সচেতন এবং আমাদের এই মনোভাব ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ সেক্রেটারি কর্তৃক হাউস অব কমন্সে ইতিমধ্যে ব্যক্তও করা হয়েছে। আমরা ভারত সরকারের কাছ থেকে এই মর্মে নিশ্চয়তা পেয়েছি যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ অথবা বাধার সৃষ্টি করবে না। এই গোপনীয় ও ব্যক্তিগত বার্তায় আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি নিজেও মনে করি, এটি পাকিস্তানের একান্তই অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। গত জানুয়ারি মাসে আমার ইসলামাবাদ সফরের পর থেকে আমাদের মধ্যে খোলা ও বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং আমি আশা করব, আপনিও আমাকে সব ব্যাপারে সম উদারতা ও সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সঙ্গে জানাতে দ্বিধা করবেন না। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিকে আপনি কীভাবে দেখছেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান বিবাদ বন্ধে আপনি কী ভাবছেন এবং কী করে এর একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছা সম্ভব সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী, সে সম্পর্কে জানাতে ভুলবেন না। আপনি আমার উষ্ণ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

অ্যাডওয়ার্ড হিথ

চলবে

বাংলাদেশের সুরস্রষ্টারা

আবদুল আহাদ

সাঈদ আহমদ

আবদুল আহাদ সম্ভবত ৫ ফুট ৬ বা ৭ ইঞ্চি লম্বা ছিলেন। দাড়ি কামাতেন নিয়মিত। সবসময় ফিটফাট থাকতেন। জামাকাপড় ধবধবে পরিষ্কার থাকত। স্যুট পরলে তাকে বেশ মানাত। দেখে অনুভব করা যেত না তিনি অত বড় সুরকার। চুটিয়ে পিয়ানো বাজাতেন গান শোনাবার সময়। ভুল হলে সংশোধন করতেন একবার না হলে পাঁচবার। আমাদের চিরাচরিত মাস্টারদের মতো নয়। একবার-দুবারে গান ওঠাতে না পারলে সাগরেদদের জন্য বারবার চেষ্টা করে যেতেন। অসীম ধৈর্য ছিল তাঁর। তবে রাগ করলে কেউ থামাতে পারত না। আবদুল আহাদ অতি বড় মাপের শিল্পী ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবদুল আহাদ খান। তবে খান বাদ দিয়ে নাম লিখতেন। কলকাতায় বন্ধু মহলে তিনি চুনীবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। আবদুল আহাদের আদি পরিবার ফরিদপুরের। ১৯২০ সালে রাজশাহীতে তার জন্ম। পিতা আব্দুস সামাদ খান আর নানা খান বাহাদুর মোহাম্মদ সোলায়মান শিক্ষা বিভাগে চাকরি করতেন। আবদুল আহাদের বাল্যকাল কেটেছে পাবনা শহরে। তাদের পরিবারের পেশা ছিল চাকরি। আবদুল আহাদ শৈশব থেকেই গান-বাজনায় নিমজ্জিত ছিলেন। এজন্য বাবা রাগ করতেন। আবদুল আহাদের মামা বজলে কাদের সঙ্গীতরসিক ছিলেন। তিনি বাঁশি বাজাতেন ভালো। গানও গাইতেন। তার বাড়িতে অসংখ্য রেকর্ড আর অর্গান ছিল। মামা-ভাগ্নে মিলে গান-বাজনা করতেন। সময় ভালোই কেটে যেত। করিম খাঁ ও ফৈয়াজ খাঁর রেকর্ড শুনে আত্মহারা হয়ে যেতেন। তার বোন সাইদা খানম একজন প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার। দেশ-বিদেশে নাম কুড়িয়েছেন। প্রফেসর হামিদা খানম হোম ইকোনমিক্স কলেজে দীর্ঘদিন প্রিন্সিপাল পদে ছিলেন। বড় বোন মিসেস মহসিনা আলী শিল্পী ছিলেন।

আবদুল আহাদ ১৯৩৪ সালে কলকাতায় আসেন। সেই সময় মন্‌জু সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনিই তার প্রথম ওস্তাদ। ১৯৩৬ সালে অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে গজল ও ঠুমরি গেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। একজন মুসলমান ছেলের জন্য এটা খুব গৌরবের কথা। ১৯৩৮ সালে মাদ্রাজে বেড়াতে গেলেন। খবরের কাগজে দেখতে পেলেন শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতের ওপর স্কলারশিপ দেওয়া হবে। ব্যস! বলা নেই কওয়া নেই একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে আমন্ত্রণপত্র পেলেন কলকাতায় ফেরার পর। মুসলমান ছাত্র হিসেবে তিনি প্রথম স্কলারশিপ পেলেন। ওই সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভালো ছিল না। কিন্তু আবদুল আহাদ নিজগুণে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার পর আস্তে আস্তে আবদুল আহাদের নাম জানতে পারল সবাই। খুবই মেধাবী ছিলেন। সবাই তাকে পছন্দ করত। চার বছর আবদুল আহাদ শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন। ওই সময় তার সঙ্গে রাজেশ্বরী বাসুদেব আর কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধুত্ব হলো। একদিন কবিগুরুকে গান শোনাবার পালা। উত্তরায়নে কবির বাসভবনে চেয়ারে হেলান দিয়ে কবিগুরু তার গান শুনছেন। আবদুল আহাদ গাইলেন 'দিনের পর দিন যে গেল' গানটি। গান শেষে কবিগুরু সাধুবাদ জানালেন। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন প্রতিটি ঋতুতে কোনো না কোনো উৎসব হতো। তবে বর্ষা ও বসন্তের উৎসব খুব বড় করে হতো। বর্ষামঙ্গল উৎসবে কবিগুরুর কাছ থেকে প্রতিবছর কিছু না কিছু উপহার পাওয়া যেত। এবার পাওয়া গেল ১৬টি বর্ষা ও একগুচ্ছ বসন্তের গান। ১৯৪১ সালে কবিগুরু বিদায় নিলেন এ পৃথিবী থেকে।

কবিগুরুর মৃত্যুর পর আবদুল আহাদ কলকাতা চলে এলেন। কলকাতার গ্রামোফোন কোম্পানি তাকে শিল্পী ও প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিলেন। ওই সময় পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া 'যখন গহন রাত্রি', 'তুমি কি কেবলি ছবি', হেমন্ত মুখার্জির 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়' ও 'হে নিরুপমা', 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা', 'পাগলা হাওয়া বাদল দিনে', 'তোমায় গান শোনাব'। সুচিত্রা মিত্রের 'মরণ রেতুহ মম শ্যাম সমান', 'হৃদয়ের একূল ওকূল' এবং শান্তিদেব ঘোষের 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' ইত্যাদি গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

ওবায়দুল হক (হিমাদ্রি রায়) তখন কলকাতায় *দুঃখে যাদের জীবন গড়া* ছবি তৈরি করেন। ছবিতে ফতেহ লোহানী কিরণ কুমার নামে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। *দুঃখে যাদের জীবন গড়া* ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেন আবদুল আহাদ। সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি কয়েকবার গান গাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে আবদুল আহাদ ঢাকায় ফিরে এসে রেডিও পকিস্তানে চাকরি নেন। ১৯৪৮ সালেই পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডে বেতার ভবনে এ দেশের সঙ্গীতের নতুন পর্যায় শুরু হলো। তবে বেতারে গীতিকার নেই, সুরকার নেই, সঙ্গীতশিল্পী নেই। হিন্দু শিল্পীরা কলকাতায় চলে গেছেন। এ অবস্থায় কবি সিকান্দার আবু জাফর, কবি ফররুখ আহমদ, কবি আহসান হাবীব, সাঈদ সিদ্দিকী আর আমার বড় ভাই নাজির আহমদ গান লিখতেন আর আবদুল আহাদ সুরারোপ করতেন। এটা বলা যায় যে দেশাত্মবোধক ও আধুনিক গানের সুরস্রষ্টার পথিকৃৎ ছিলেন আবদুল আহাদ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক ছাড়াও তিনি এ দেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচলন ও প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ফতেহ লোহানীর *আছিয়া* ছবির তিনি ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক। 'এই বাংলার সবুজ শ্যামলে' ও 'আমার দেশের মাটির গন্ধে' জনপ্রিয় এ গান দুটির তিনি সুরকার। সঙ্গীতে অবদানের জন্য ১৯৭৮ সালে তিনি 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' পেয়েছেন।

আবদুল আহাদের সুর করা কয়েকটি আধুনিক জনপ্রিয় গান হলো : 'আমি সাগরের নীল', 'ভ্রমরের পাখনা যতদূর থাক না', 'অনেক বৃষ্টি ঝরে তুমি এলে', 'শিল্পী আমি তাই কবিতা আমার ভালো লাগে' ইত্যাদি।

১৯৫৪ সালে আবদুল আহাদ বার্মা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া সফর করেন। ১৯৫৬ সালে এক বছরের বৃত্তি

নিয়ে তিনি স্পেনে যান। ওই সময়ে তিনি স্প্যানিশ মিউজিক শেখেন। স্প্যানিশ 'নৃত্য' ও 'বলেরো' তাল তার ভালো লাগত। বলেরো একটা জিপসি নাচ। আর মুরিশ সুর, ক্যাস্টানেটের সঙ্গে বাজানো হয়। ১৯৬৫ সালে তিনি চীন সফর করেন। ইরানের সিরাজের আর্ট উৎসবে যোগ দেন। সেই সময় ইরানের শাহ তুঙ্গে ছিলেন। তাকে 'সিরাজে আর্জ্যুমেহের' উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালে আবদুল আহাদ রাশিয়া সফর করেন। ওই বছরে তিনি কানাডায় অনুষ্ঠিত বিশ্বসঙ্গীত সেমিনারে যোগ দেন। ১৯৭৭ সালে সাংস্কৃতিক দলের নেতা হিসেবে ব্রিস্টলে ও পরে লন্ডনে যান। নরওয়ের দুটি শহর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন তিনি।

লেখক হিসেবেও আবদুল আহাদের খ্যাতি ছিল। তিনি *গণচীনে চব্বিশ দিন* বইটির লেখক। *নব দিগন্তে গান* নামে তার একটি স্বরলিপির বই আছে।

১৯৪৮ সালে কোলকাতা থেকে ঢাকা ফেরার পর আবদুল আহাদ আমাদের পুরান ঢাকার ১৭ নম্বর আশেক লেনের বাড়িতে ওঠেন। যতদিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন গানের মহফিল খুব জমত। নাজির ভাই গান লিখতেন আর আবদুল আহাদ সুর করতেন। ফতেহ লোহানী ও আবদুল আহাদ আমাদের বাড়িতে এক কামরায় থাকতেন। কখনো কখনো কবিতা আবৃত্তি করতেন ফতেহ লোহানী। ওর সুরেলা কণ্ঠে সবাই মুগ্ধ হতো। আমার মা উপরতলা থেকে খানা পাঠাত। এভাবে কেটে গেল দুবছর। পরে আমাদের ইসলামপুরের ৩৪ নম্বর আওলাদ হোসেন লেনের নতুন বাড়িতে আবদুল আহাদ, ফতেহ লোহানী ও তার ভাই ফজলে লোহানী থাকতেন। ওদের দুজনের মধ্যে একটা লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল যে, আবদুল আহাদ ছিল খুব স্বল্পভাষী ও খুব গোছালো প্রকৃতির মানুষ। পক্ষান্তরে, ফতেহ লোহানী ছিলেন খুবই অগোছালো ও হাস্যপরিহাসপ্রিয়। আমার ভাই নাজির আহমদ ওদের দুজনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করতেন সবসময়। ফতেহ লোহানীর ছোট বোন বিশিষ্ট গায়িকা হুসনা বানু খানম তখন আজিমপুর কলোনিতে থাকতেন। আবদুল আহাদ প্রায়শই তাকে গান শেখাতে যেতেন। ১৯৪৮ সালে বোম্বে ছায়াছবি জগতের স্বনামধন্য গায়ক তালাত মাহমুদের সঙ্গে হুসনা বানু খানম একটি যুগল গান রেকর্ড করেন।

আমাদের বাড়ির বিপরীত দিকে লায়ন সিনেমা। ওরা সবাই নির্দ্বিধায় নিয়মিত সিনেমা দেখতেন। আবদুল আহাদ ছিলেন গানের পাগল। হলে কান পেতে শুনতেন বোম্বে টকিজের হিন্দি গান। একদিন আমার চাচা মীর্জা আবদুল কাদের হলে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবদুল আহাদ ও ফতেহ লোহানী উঠে বেরিয়ে গেলেন। চাচার সামনে সিনেমা দেখার সাহস হলো না। চাচা লোক পাঠিয়ে দুজনকে আসতে বললেন। ওরা এসে সিনেমা দেখুক। নাজির ভাইকেও ডেকে পাঠালেন। সবাই এসে সিনেমা দেখল।

আমাদের সঙ্গীত ভুবনের এক অসাধারণ শিল্পী ছিলেন আবদুল আহাদ। স্বল্পভাষী, মিশুক, উদার প্রকৃতির এই শিল্পী সহাস্যে অসীম প্রেরণা দিতেন সাগরেদদের। একবার না পারলে বারবার তালিম দিতেন। শিল্পের পেছনে তিনি যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তা ভোলার নয়। উনি মারা যান ১৯৯৪ সালে। ১৫ মে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আবদুল আহাদকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হয়-আমার সোনার বাংলা গানটির শুদ্ধ স্বরলিপি সংগ্রহ করে আনার জন্য। একজন শিল্পী শুধু নয়, একজন সুরকার হিসেবেও তিনি অমর হয়ে থাকবেন।